"রা—ম্বা"

শ্রীরতিরঞ্জন দত্ত

ইষ্টরাগরঞ্জিতেষু

লেখকের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই :

মানবজমিন

যাও পাখী

উজান

ঘুণপোকা

দূরবীণ

পারাপার

গল্প সংগ্রহ

স্বনির্বাচিত গল্প

বাছাই গল্প

দেশান্তরী

কাগজের বউ

হৃদয় বৃত্তান্ত

পয়মন্ত

পাপ

আক্রান্ত

তিথি

গতি

কীট

বন্দুকবাজ

পল্টনের একটাই গুণ ছিল। সে খুব ভাল বন্দুকবাজ ছিল। বন্দুক বলতে আসল জিনিস নয়—হাওয়া-বন্দুক। চিড়িয়া, বাঘ এমন কি ইঁদুর মারার যন্ত্রও সেটা নয়। তবে অল্প পাল্লায় চাঁদমারী করা যায় বেশ, আর পল্টনের হাওয়া-বন্দুকটা ছিল ভাল। তার জমিদার দাদু জার্মানী থেকে আনিয়ে দিয়েছিলেন।

জীবনটাকে প্রথম খাট্টা বানিয়ে ছাড়ল ইস্কুলের মাস্টাররা, আর বাবা। দিনরাত কেবল পড় পড়। শেষ মেষ 'পড় পড়' শব্দটা তার কানে আরশোলার মত ফড় ফড় করে বেড়াত, মাথার মধ্যে ফরর, ফরর করত।

বন্দুকবাজ ছিল তখন থেকেই।

দাদুর জমিদারী বাবা বিফলে দিল। তারপর থেকে শুখো ভদ্রলোক তারা। নিমপাতা দিয়ে ভাত খায়।

বাবা কেবল হুড়ো দেয় তখন—মানুষ হ। দাঁড়া' নইলে মরবি।

পল্টন জানে, বাবা এখন ছেলের মধ্যে তাগদ চায়। বাপ নিজে সুপুত্র ছিল না। তবে খারাপ দোষও কিছু নেই। চটপট বড়লোক হতে গিয়ে ফটাফট টাকা বেরিয়ে গেল। বাড়িটা রইল শুধু। তা সে বাড়িরও সুরত কিছু নেই। রংচটা দাদের দাগ সর্বাঙ্গে।

পল্টনের মাথায় পড়া ঢোকে না বাপের হুড়ো খেয়ে বই মুখে হরবখত ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ করত বটে, কিন্তু মা সরস্বতীর পায়ের ছাপ পড়ত না মাথায় ঘিলুতে।

তবে বন্দুকের নিশানা ছিল ওয়া ওয়া। বিশ হাত দূর থেকে উল্টো করে ধরা পেনসিলের শিস উড়িয়ে দিত এক বারে। টান করে সুতো বাঁধো, পল্টন বিশ হাত দূর থেকে ছর্‌রা মেরে ছিঁড়ে দেবে। কোন কাজে লাগে না গুণটা কিন্তু আছে। অচল সিকি যেমন পকেটে পড়ে থাকে।

তার পথে বরাবরই নানান মাপের গাড্ডা। কখনো ছোট কখনো বড়। ক্লাস নাইনে সে প্রেমে পড়ল গার্লস স্কুলের পপির সঙ্গে। পপি পড়েনি। পড়াটা পল্টনের এক তরফা। না পড়ে উপায়ই বা কী? হুবহু মেমসাহেবের মতো দেখতে পপি, তেমনি সাজগোজ তার, আর রাজহাঁসের মত অহংকারী সে। পুরো গঞ্জের যুবজন ঢেউ খেয়ে গেল।

পপি কখনো বিনা ঘটনায় রাস্তায় হাঁটতে পারত না। রোজ কিছু না কিছু ঘটবেই।

এক ছোকরা স্রেফ হীরো বনতে গিয়ে বাঘী সিপাহীর মত দোতলার ছাদ থেকে লাফিয়ে পপির চোখ টানতে গিয়েছিল। দুটো ঠ্যাং বরবাদ।

আর একজন স্রেফ পপির জন্য গার্লস স্কুলের পুকুরে তেত্রিশ ঘন্টা সাঁতরাল। নিউমোনিয়া হয়ে সে যায় যায়।

আর একজন কেবল পপির দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আর একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর পেটে ছুরি চালিয়ে দিল। একজন জেল, অন্যজন হাসপাতালে গেল।

অনেকে গান শিখতে লাগল, ফুটবল খেলতে লাগল, ছবি আঁকতে লাগল, গল্প বা কবিতা লিখতে লাগল সব পপির জন্য।

পপি কি ভালবাসে? কি পছন্দ করে তা তো কারো জানা ছিল না।

পল্টনের আর কিছু নেই, বন্দুক আছে। এক বাজীকর বাজী দেখিয়ে মাতা মেরীর আশীর্বাদ পেয়েছিল। গল্পটা জানত পল্টন। বাজীতে যদি হয় তো বন্দুকে হবে না কেন? পল্টন গিয়ে ডালিমের সেলুনে চুল ছাঁটল সেদিন, সবচেয়ে ভাল হাফ প্যান্ট আর শার্টটা পরল। আর জুতোও পরল, যা সে কদাচিৎ পরে।

আমতলার রাস্তা দিয়ে পপি ইস্কুলে যাচ্ছে। সঙ্গে হরেক কিসিমের ফুরফুরে মেয়ে।

সব ডগমগ। আর আড়াল আবডালে, আগে পিছে ছোকরারা নানা কায়দা করে চোখ টানার চেষ্টা করছে।

পল্টন ঠিক করল, দেখাবে। পপির বাঁ বুকের ওপরে সাঁটা ইস্কুলের মেটাল ব্যাজ। বেশ ছোট ব্যাজ। পল্টন আমগাছের আড়াল থেকে বন্দুক তাক করল। বেশ শক্ত কাজ। প্রথম, পপি চলছে। দ্বিতীয়, তার চারদিকে বিস্তর চেলী চামুন্ডী।

কিন্তু বন্দুকবাজ পল্টন তো আর কাঁচা হাতের লোক নয়। সে ব্যাজটাকে ভাল মত নিরীখ করে ঘোড়া টিপে দিল। ব্যাজটাকে টিপে দিয়ে লোহার গুলি লাফিয়ে উঠে পপির পা ছুঁল। ভয়ে কিন্তু ফসকায়নি।

কিন্তু পপির চোখের সামনে রুস্তম বলবার সাধ যারা এতকাল ধরে পুষছে তারা ছাড়বে কেন ?

পপির লাগেনি, অলৌকিক হাতের টিপ পল্টনের। টিনের ব্যাজটা টোল খেয়ে গেছে। কিন্তু তখন কে শোনে তার কথা।

ভুলটা কোথায় হয়েছে বুঝবার আগেই তার মাথা থেকে সিকি চুল খামচে তুলে নিল ছোকরারা, পেট ফাটানো লাথি চালাল, নাক থ্যাবড়া করে দিল ঘুঁষিতে। তিনটে দাঁত নড়বড়।

প্রথমে ভয় খেলেও মার দেখে খুব হেসেছিল পপি আর তার বান্ধবীরা।

বন্দুকটা সেই গোলমালেও বেঁচে গিয়েছিল। সেটার উপর কেউ কেন কে জানে আক্রোশ দেখায়নি।

মারের শেষ হল না। ইস্কুলে খবর হল। পরদিনই তার বাবার কাছে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট গেল ইস্কুল থেকে। ব্যথা বেদনার শরীরের ওপর বাবা আর এক দফা চালাল। সেই রাতেই বন্দুক ঘাড়ে রাস্তায় নামল পল্টন। একটু খুঁড়িয়ে, কঁকিয়ে, মাঝে মাঝে চোখের জল ফেলে।

ভোর হল শহরতলীতে। লেভেল ক্রসিং-এ একটা ফাঁকা গুমটি ঘর পেয়ে শুয়ে গিয়েছিল পল্টন। ভোর হল প্রচন্ড খিদেয় পিপাসায়। ভোর হল ভয়ে।

কিন্তু ভোর তো হল !

পল্টন ভারী শহরে ঢুকে চারদিক দেখে। বাবার সঙ্গে বহুবার এসেছে, তখন খারাপ লাগেনি। এখন মনে হল, ই বাবা, এখানে আবার না জানি কি হবে। কিন্তু ডরফোকের ইজ্জত নেই। সঙ্গে বন্দুক তো আছে এখনো। প্রথম পল্টন তার আংটি বেচল। তারপর খেল পেট ভরে।

বাজারের কাছে বন্দুক হাতে ঘোরাঘুরি করার সময় বহু লোক তাকে ফিরে ফিরে দেখতে থাকে। কয়েকটা বাচ্চা ছেলে পিছুও নেয়। একটা ছেলের হাতে আধ খাওয়া জিলিপি। পল্টন তাকে বলল,

জিলিপিটা ধরে দাঁড়া।

ছেলেটা দাঁড়ায়। বিশ হাত দূর থেকে পল্টন বন্দুক মারে, জিলিপি পড়ে যায়।

ছেলেটা কেঁদে ওঠে বটে, কিন্তু বহু লোক তাকে সাবাস দিতে থাকে।

তো পল্টনের পয়লা কাম সাফা, এ কাজটা হল সবচেয়ে শক্ত কাজ। ঢোকা, ঢুকে পড়া। পল্টন পয়লা গুলিতেই শহরে ঢোকার রাস্তা করে নিল।

সে জোগাড় করল আলপিন, ছুরি, টমেটো, আলু, সুতো আর যত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জিনিস আছে। ছুরির মাথায় টমেটো গেঁথে, সুতো ঝুলিয়ে আলপিনের ডগা লক্ষ্য করে, সে দমাদম বন্দুক মারে। একটা তাস দাঁড় করিয়ে যে কোন ফোঁটায় গুলি লাগায় দশ বিশ হাত দূর থেকে।

গুলি ফসকায় না। মোমবাতির শিখা নিভিয়ে দেয়, উড়ন্ত মার্বেল ছট্‌কে দেয়।

দিনে দেড় দু'টাকা রোজগার দাঁড়াল। কোই পরোয়া নেই। একটা চালের আড়ত পাহারা দেওয়ার কাজ পেল, সেইখানেই মাথা গোঁজার জায়গা আর দুবেলা খাওয়া। সারাদিন শহরের এখানে সেখানে বন্দুকবাজী। তবে ভুলেও সে আর মেয়েদের দিকে তাকায় না। ওপড়ানো জায়গায় ফের চুল গজাতে অনেক সময় লেগেছে।

তো বন্দুক আর পল্টন আছে। আর কি চাই?

আড়তের মালিক চেন্টুবাবুর আসলী বন্দুক আছে। দুটো নল দিয়ে আগুনের সীসে ছটকায়। চেন্টু বলে—চালাবি?

উদাস স্বরে পল্টন বলে—ও বড় ভারী জিনিস।

দূর ব্যাটা! অভ্যাস কর।

পল্টন আসল বন্দুকের খদ্দের নয়। সে কোনদিন পাখি মারেনি, বাঘ মারেনি, বেড়াল পর্যন্ত নয়। জীবজন্তু মারতে বড় কষ্ট হয়। আসল বন্দুকে তার তবে কাজ কি?

কিছুদিন যায়। হাওয়া বন্দুকের খেল্ শহরে পুরোনো হয়ে গেছে। নতুন আর কিছু না দেখালে লোকে তাকাবে কেন?

খুব ভাবে পল্টন। সে চিৎ হয়ে, উপুড় হয়ে, হেঁটমুন্ডু হয়ে

বহু লক্ষ্যভেদ দেখিয়েছে। কিন্তু তাও তো সব দেখা হয়ে গেছে মানুষের। আর কি বাকি আছে?

রাতের বেলা হাওয়া-বন্দুক কোলে নিয়ে পল্টন জেগে বসে আড়ত পাহারা দেয় আর ভাবে। ভাবতে ভাবতে একদিন চেন্টুবাবুকে বলল—বন্দুক ছাড়া আর তো কিছু জানি না। তা বললেন যখন তো দিন আপনার মারণ কল। চালাই।

পারবি তো?

প্র্যাকটিস তো করি।

চেন্টুবাবু বন্দুক দিলেন। বললেন—গুলির বড় দাম। সাবধান, বেশী খরচ করিসনি।

খুবই ভারী বন্দুক, হাওয়া-বন্দুকের পাঁচগুণ। চেন্টুবাবু তাকে নিয়ে এক ছুটির দিনে শহরের বাইরে গেলেন বন্দুক শেখাতে।

সারাদিন দমাদম চাঁদমারী হল। দিনের শেষে চেন্টুবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—তুই শালা একলব্যের বংশ।

মিথ্যেও নয়। আসলী চীজ পয়লা দিন ধরেই পল্টন খেল দেখিয়েছে। পিসবোর্ডে আঁকা গোল টার্গেটের ঠিক মাঝখানে একটার পর একটা গুলি পাম্প করে দিয়েছে। এদিক ওদিক হয়নি চেন্টুবাবু শূন্যে ঢিল ছুঁড়েছেন, আর পল্টন সেই ঢিল ছাতু করেছে। তারপর নারকোল পেড়েছে বন্দুকে, বটের ফল পেড়েছে, সব শেষে একটা ওলটানো কাঁচের গ্লাসের ওপর রাখা একটা কমলালেবু ছ্যাঁদা করেছে, গ্লাসটার চোট হয়নি।

শহরে শখের শিকারী কিছু কম নেই। পল্টনের বন্দুকের হাত সবাই জেনে গেল সেই থেকে সে শিকার-পার্টির সঙ্গী। ছুটির দিনে কেউ না কেউ এসে বলবেই চল রে পল্টন।

পল্টন যায়। নিজের হাতে জীবজন্তু সে মারে না। তবে বন্দুক বয়। গুলি ভরে দেয়। সঙ্গে থাকে। কথা কম বলে সে। কেউ চাইলে বন্দুকের নানা ভেলকী দেখায়। চলন্ত জীপগাড়ি থেকে টার্গেট মারে। ঘোড়ার পিঠ থেকে পিছন ফিরে লক্ষ্যভেদ করে, হেঁটমুন্ডু হয়ে নিশানায় গুলি লাগায়।

বিশ্বাসবাবু বললেন—তা পাখি মারিস না কেন?

কষ্ট হয় বাবু। পাখির তো বন্দুক নেই। সে উঠে কি চালাবে?

ব্যাটা ফিলজফার !

পল্টন জানে মারটা উভয় পক্ষের হাওয়াটা হক্কের। এক তরফা ভাল নয়। পাখি বন্দুক চালালে সেও উল্টে চালাতে পারত।

চৌধুরী সাহেব বললেন—কিন্তু বাঘ ?

বাঘেরও বন্দুক নেই। তাছাড়া সে তো আমার ঘরে গিয়ে হামলা করেনি। বরং তার জায়গায় এসে আমিই ঝামেলা চালাচ্ছি—

তোর কপালে কষ্ট আছে।

সে জানে পল্টন। কপালে কষ্ট তার নেই তো কার আছে।

অফিসারদের ক্লাবে পল্টন চাকরি পেয়েছে। টেনিস বল কুড়িয়ে দেয়, ঘাস ছাঁটে, গল্‌ফের ব্যাগ বয়ে নিয়ে যায়, মদ ঢেলে দেয়। একদিন খেয়ালবশে গল্‌ফ স্টিক চালিয়ে বহু দূরের গর্তে বল ফেলল।

মিত্র সাহেব বীয়ারের জাগ হাতে রঙীন ছাতার তলায় বসে ছিলেন। দেখে বললেন—হোল ইন ওয়ান ! আবার মারো তো !

আবার মারে পল্টন এবং এবারও গর্তে বল ফেলে। সেই থেকে পল্টন এক নম্বর গল্‌ফ খেলোয়াড়। সেই থেকে সে বিলিয়ার্ডেও সবচেয়ে চৌখস। পল্টন ছাড়া সাহেবদের চলে না। পল্টন ছাড়া ক্লাব অচল। কাছাকাছি বউ বা প্রেমিকা থাকলে কোন সাহেবই পল্টনের সঙ্গে বড় একটা বিলিয়ার্ড বা গল্‌ফ খেলে না।

গুহ সাহেব নতুন এসেছেন। সুন্দরী স্ত্রী।

[গল্পের নিয়মে গুহ সাহেবের স্ত্রী হতে পারত সেই পপি। জীবন তো অনেক সময় গল্পের মতই হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, গুহ সাহেবের স্ত্রী পপি নয়। অন্য একজন—।]

পল্টন বিলিয়ার্ড টেবিলে একা একা বল চালাচালি করছিল। সাহেবরা কেউ আসেনি তখনো।

গুহ সাহেব হাত গুটিয়ে বললেন, হয়ে যাক এক হাত।

হল। হেরে ভূত হয়ে গেল গুহ। পল্টন গা লাগিয়েও খেলল না।

পরদিন গল্‌ফে সে গুহ সাহেবকে একদম বুড়বক বানিয়ে ছাড়ল।

কিন্তু গুহ সাহেব বুড়বক হতে পছন্দ করেন না। তিনি বিদেশে বিস্তর গল্‌ফ আর বিলিয়ার্ড খেলেছেন। কম্পিটিশনে শুটিং করেছেন। তাই ক্রমে ক্রমে তাঁর পল্টনের সঙ্গে একটা অদেখা শত্রুতে গড়ে উঠতে থাকে।

শীতকালে জলায় বাঘ আসে। সেবারও এলো। সাহেবরা বন্দুক কাঁধে বাঘ মারতে চললেন।

সঙ্গে পল্টন।

জঙ্গলে বিটিং হচ্ছে। জঙ্গলের বাইরে দু'সার বন্দুক তৈরি।

পল্টন দূরে একটা গাছতলা বেছে ছায়ায় বসে আছে। বসতে বসতে ঢুলুনি এলো। শুয়ে গেল সেইখানেই। বাঘটা বেরোল বিদ্যুৎশিখার মত। তারপর ঢেউ ঢেউ হয়ে ছুটতে লাগল খোলা মাঠ দিয়ে, আগুনের মত উজ্জ্বল শরীরে।

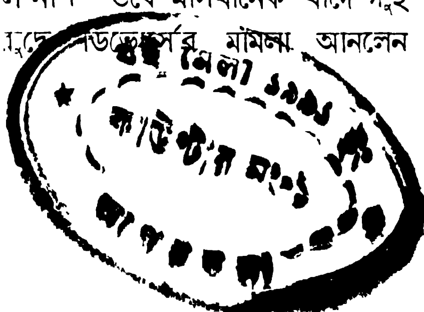
মোট দশখানা বন্দুক গর্জে উঠল দুই সারি থেকে। তারপর গর্জাতে লাগল। ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার, বারুদের গন্ধে বুক ছিঁড়ে যায়।

বাঘটা ঝাঁঝরা হয়ে পড়ে গেল ধানের ক্ষেতে। তার রক্তে মাটি উধ্ব হতে লাগল।

পল্টন শুয়ে ছিল টিলার মত উঁচু জায়গায়। গাছতলায়। সবই ঠিক আছে তার। শুধু তোলা হাঁটুটার মাঝখানে একটা ছ্যাঁদা। তীর বেগে রক্ত বেরোচ্ছে।

যখন সবাই ঘিরে ধরল তাকে সে কাতর স্বরে বলল, সাবাস! লেগেছে ঠিক। ঠিক লেগেছে। সাবাস সাহেব।

কাকে বলল কেউ বুঝতে পারল না। তবে মাসখানেক বাদে গুহ সাহেবের স্ত্রী তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে ডিভোর্সের মামলা আনলেন আদালতে।



গৌরী

পাড়ার জ্যাঠামশাইগিরি করা তুমি একটু কমাবে দাদা ? প্লীজ ! মিলুর কথাটা নতুন কিছু নয়, রোজ শুনছি। মিলু বলছে, মা বলছে, ভাই বলছে, অনেকেই বলছে। কিন্তু জ্যাঠামশাইগিরি করা বলতে যথার্থ যা বোঝায় আমার কাজটা সেরকম নয়। এক সময়ে আমি দীর্ঘকাল বেকার ছিলাম। বেশ লেখা পড়া জানা বেকার। তবে বেকারত্বের জ্বালা-যন্ত্রণা তেমন ছিল না। কারণ আমার বাবা একটা ভদ্রগোছের চাকরী করতেন এবং সংসারে তেমন কোনো অশান্তি ছিল না। অন্ততঃ অভাবজড়িত অশান্তি নয়। সে সময়ে এই অঞ্চলে নতুন বাড়ি করে উঠে এলেন।

শহরতলী যেমন হয় এই অঞ্চলও তেমনই। খানিক বস্তি, কিছু নিম্নবিত্ত, কিছু মধ্যবিত্ত যোগাযোগহীন হয়ে বাস করে। যে যা খুশি করে কেউ মাথা ঘামায় না, এ পাড়ার যুবকেরা কতিপয় ভাল, কতিপয় খারাপ, কতিপয় গুন্ডা বদমাশ। আসলে গোটা কলকাতার মতই এ পাড়ারও নির্দিষ্ট কোনো চরিত্র নেই।

আমরা এলাম জুলাইতে। সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে হঠাৎ চাঁদার উৎপাত এবং জুলুম শুরু হয়ে গেল। পঞ্চাশ থেকে দেড়শো দুশো টাকার বিল কেটে ফেলে রেখে যায় সন্তানসদৃশ ছেলেরা। আপত্তি বা অপারগতার কথা কানে তোলে না। প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়ে যায়। বুঝলাম, পাড়ায় নতুন এসেছি বলে পেয়ে বসেছে।

আত্মরক্ষা হয়তো করা যেত। কিন্তু সেটাও এক ধরনের আসকারা দেওয়া। তাতে টাকার অংক কিছু কমবে কিন্তু ভবিষ্যতে জুলুমের জন্য ফের তৈরী থাকতে হবে।

বাড়ির বড় ছেলে হিসেবে আমারই উচিত এসব ঝামেলা সামাল দেওয়া। কিন্তু বস্তুত সামাল দেওয়ার কোনো উপায় মাথায় আসছিল না।

এই সময়ে একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটে গেল। বাড়ির পিছনে এক বস্তি ছিল। দুপুর বেলায় সেখানে একজন বুড়ো লোক মারা গেল রোগে ভুগে। খুব কান্নাকাটি পড়ে যেতেই আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেদিকপানে গেলাম। ঘটনাটা তেমন গুরুতর শোকাবহ

ছিল না। বুড়ো লোকটার বয়স নব্বুই পার। সরকারী চাকরির পেনশন টানছিল এতদিন। বুড়ির বয়স আশির কাছাকাছি, খুব তেজী গলায় কাঁদছে। আর কাঁদছে ছেলের বউ, পাড়াপড়শীও কেউ কেউ।

খোঁজ করে জানলাম, বুড়োর ছেলে আসানসোলে কী একটা কাজে গেছে। ফিরতে কয়েকদিন দেরী হবে। টাকা পয়সাও তাদের হাতে বিশেষ নেই।

বেকার বলেই বোধ হয় ঝামেলাটা কাঁধে নিয়ে ফেললাম। বস্তির ছেলেরাই জুটে গেল। একটা শো দেওয়ার জন্যই পুরনো হাতঘড়িটা খুলে বুড়োর ঘাট-খরচ বাবদ টাকা জোগাড় করতে কাজে লাগিয়ে ফেললাম। শ্মশান অবধি যেতে পিছপা হইনি। ব্যাপারটা যখন মিটল তখন ঠিক হীরো না হলেও বস্তিবাসীর কাছে আমি রীতিমত কেউকেটা।

এই সূত্রটা ধরেই এ পাড়ায় আমার দাদাগিরি শুরু। একে একে পাড়ার ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে চেনা-জানা হয়ে যেতে লাগল। খুঁজে খুঁজে আমি শুরু করে দিলাম পরোপকার। এছাড়া রাস্তা পরিষ্কার, নর্দমা সাফাই, কচুরিপানা তোলা, গরিবের কন্যাদায়ে ঝাঁপিয়ে পড়া, রোগ-ভোগ দুর্ঘটনায় বুক দিয়ে গিয়ে পড়া এসব তো ছিলই।

বছরখানেকের মধ্যে এ পাড়ায় আমার প্রভাব প্রতিপত্তি হল বেশ ব্যাপক। চাঁদার ঝামেলা গেল, আমার সুন্দরী বোনটির কলেজে যাওয়া-আসা নিরাপদ হল, দ্বীপবাসীদের মত আমা আর পাড়া থেকে বিচ্ছিন্ন রইলাম না।

আবার ঝামেলা বড় কমলোও না। জ্যাঠাগিরি করতে গিয়ে বাড়িতে লোক সমাগম বাড়তে লাগল। রাত দুপুরে মড়া-পোড়ানোর ডাক পড়ে, সাঁঝ-সকালে মারপিট, দাঙ্গা কাজিয়া মেটাতে বেরোতে হয়। অর্থ-প্রার্থীও অনেক আসে।

পাড়া উদ্ধার করতে করতেই একদিন হঠাৎ একটা বড় কোম্পানিতে টপ করে ভাল পোস্টে চাকরী জুটে গেল। ঘটনাটা শুনতে আকস্মিক, কিন্তু ততটা বিস্ময়কর নয়। বাবার এক বন্ধু ওই কোম্পানির প্রায় সর্বেসর্বা। এতকাল বিদেশে ছিলেন। দেশে ফিরে বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। নিজেই যেচে বলেছিলেন, উদ্ধব, তোমার বড় ছেলেটা যদি এখনও চাকরি পেয়ে না থাকে তো আমার

কাছে পাঠিয়ে দাও। কোম্পানি এক্সপ্যাণ্ড করছে, লোক নেবে। ভাল মাইনেয় ঢুকিয়ে দিতে পারব।

মাইনে সামান্যই, কিন্তু এসব কোম্পানিতে অন্যান্য ভাতা এত বেশি যে প্রথম চোটেই আমি দেড় হাজারের কাছাকাছি পেতে শুরু করলাম।

আর বেকার নেই। সুতরাং পাড়াতুতো ঝামেলা ঘাড় থেকে নামিয়ে মোটামুটি গার্হস্থের দিকে পা বাড়ানোই যুক্তিযুক্ত ছিল বোধহয়।

কিন্তু জনপ্রিয়তার লোভে এবং ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়লেও দশজনের ঝামেলা কাঁধে নেওয়ার মধ্যে একটা নেশাও আছে। যখন দেখি কিছু লোক আমার ওপর নির্ভর করছে, আমাকে বিশ্বাস করছে এবং আমাকেই ভরসা হিসেবে মনে করছে তখন নিজেকে গণ্ডীবদ্ধ করে রাখাটা আমার ভাল লাগল না। আমার পরিচিতির পরিধি অনেক বেড়েছে। এ পাড়া ও পাড়া জুড়ে বিচ্ছিন্ন ক্লাব, সংগঠন ইত্যাদিকে এককাটা করার একটা চেষ্টা আমার ছিলই। একটা কমিউনিটি সেণ্টার খোলার জন্য খানিকটা ভেস্ট জমি দখল করেছি, সেটার সরকারী অনুমোদন আদায় করতে হবে। পুরনো বাজার ভেঙে নতুন পাকা বাজার বসানোর জন্য কর্পোরেশনকে প্রায় রাজি করিয়ে ফেলেছি। একটা গ্রন্থাগার খুলল বলে। এসব কাজ যে কতটা তৃপ্তিকর তা যে করেনি সে বুঝবে না। আশ্চর্য এই যে, ছেলে-ছোকরারা ছায়ার মত আমার পিছু পিছু ঘোরে, কোনো কাজেই তারা পিছপা হয় না। ঝগড়া মারপিট হয় না যে তা নয়, তবে নিয়ন্ত্রিত থাকে।

কিন্তু বাড়ির লোক এখন বাস্তবিকই বিরক্ত। এত লোকের আনাগোনা যে একটুও প্রাইভেসি থাকে না। চা-চিনির খরচ আছে, আছে সাহায্য ইত্যাদি। উপরন্তু আমার সঙ্গীরা বিশেষ ভদ্রলোক তো না।

মিলু আমাকে বকে বটে, কিন্তু আমার এই স্বভাবটা যে তার খুব অপছন্দ নয় তা তার মুখ দেখেই বুঝি। ভাইও আমাকে অত্যন্ত অপছন্দ করে না। কিন্তু মুশকিল হল, আমার স্বভাবের সঙ্গে তাদের স্বভাবের বিশেষ মিল নেই।

আজকাল গৃহবধূ হত্যার বা আত্মহত্যার ব্যাপার নিয়ে বেশ একটা সোরগোল উঠেছে। এ নিয়ে আমার অবশ্য মাথাব্যথা ছিল না।

আমি বিয়ে করিনি, করার ইচ্ছেও নেই। বাড়িতে অবশ্য এ নিয়ে প্রচুর তাগিদ চলছে। কিন্তু আজকালকার দাম্পত্য জীবনের ছিরিছাঁদ দেখে বিয়ের ওপর পিণ্ডি চটকে গেছে। ইচ্ছেই যায় না বিয়ে করতে।

কিন্তু জীবনের কত ঘটনাই নিজের ইচ্ছানুযায়ী ঘটে না। একদিন তাই আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই বাড়ির লোক বিয়ে ঠিক করে ফেলল। আমি আপত্তি প্রকাশ করায় বাবা বললেন, আমার মর্যাদা বলে একটা জিনিস আছে। সেটা ভুলো না। আমি কথা দিয়েছি।

অগত্যা···

গৌরীর সঙ্গে আমার বিয়েটা যে একটা আদ্যন্ত ভুল বিয়ে তা বুঝতে আমার সময় লাগল মাত্র একটি রাত। পাত্রী পছন্দ করেছিলেন ছোট কাকা। তাঁরই এক সহকর্মীর মেয়ে। আমাদের বাড়ির কারোই অপছন্দ হয়নি। বিয়ের আগে আমি পাত্রী দেখব কিনা জিজ্ঞেস করা হলে আমি দৃঢ় কণ্ঠেই বলেছিলাম, না।

বস্তুত গৌরীর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা শুভদৃষ্টির সময়। গৌরী আমার দিকে তাকায়নি। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। চমৎকার মুখশ্রী। বেশ সুন্দরী। তবে মুখে কেমন একটা কঠোর ঘৃণ্য মিশ্রিত প্রত্যাখানের ছাপ ছিল। বোঝানো যাবে না, শুধু বুঝেছিলাম মাত্র। কিংবা আন্দাজ করেছিলাম, আশঙ্কা করেছিলাম। মনে হয়েছিল, মেয়েটা এ বিয়ে খুব স্বেচ্ছায় করছে না। মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল।

বাসর জাগার আজকাল তেমন রেওয়াজ নেই। বিয়ের পর খাওয়া-দাওয়ার শেষে আমাদের দু'জনকে একখানা সুসজ্জিত ঘরে রাতের মতো পরস্পরের হেফাজতে ছেড়ে দেওয়া হল।

আমার সন্দেহপ্রবণ মন কু গাইছিল আগে থেকেই। আমি একটু সরল সোজা লোক, বেশি রহস্য ভালওবাসিনা। সোজাসুজি গৌরীকে প্রশ্ন করলাম, কী ব্যাপার বল তো!

গৌরীর সঙ্গে আমার সেই প্রথম আলাপ।

গৌরী বিছানায় পা গুটিয়ে বুকের কাছে হাঁটু মুড়ে মাথা নিচু করে ছিল। জবাব দিল না।

আমি একটু ভেতো গলায় বললাম, দেখ গৌরী, আমি প্রাক্‌টিক্যাল লোক। তোমার যদি গুপ্ত কোনো ব্যাপার থাকে তবে ফ্র্যাংকলি বল। আমি সেণ্টিমেণ্টাল নেই, সহ্য করতে পারব। এমন কি সাহায্য

করাও অসম্ভব নয়। কিন্তু প্লিজ, কিছু গোপন রেখো না। গোপন করলেই ব্যাপারটা জটিল এবং ভয়ংকর হয়ে উঠবে।

গৌরী আমার কণ্ঠস্বরের আন্তরিকতায় বোধহয় ভরসা পেল। যতদূর বুঝেছি, সে নিজেও খুব রোমাণ্টিক ধরণের নয়। মুখ তুলে আমার দিকে একবার চেয়ে মুখ নামিয়ে বলল, আমার কিছু কথা আছে। শুনলে আপনি হয়তো রেগে যাবেন।

আমি সহজে রাগি না।

গৌরী আঙুল দিয়ে আরো কিছুক্ষণ বেডকভারে আঁকিবুকি কাটল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, আপনি কি করে বুঝলেন যে, আমি সুখী নই?

ওটা কোনো ব্যাপার নয়। তোমার মুখ দেখে যে কেউ বুঝতে পারবে।

গৌরী তার চোখ মুছল। ধরা গলায় বলল, আমাকে জোর করে এই বিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, সে তো জলের মতো পরিষ্কার কিন্তু এ যুগেও যে কোনো প্রাপ্তবয়স্কা শিক্ষিতা মেয়েকে জোর করে অপছন্দের বিয়েতে বসানো যায় তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। তুমি বিয়েটা করলে কেন?

গৌরী মাথা নিচু করে রইল। একটু সময় নিয়ে বলল, বাবা মা এত কান্নাকাটি করলেন, আত্মহত্যা করবেন বলে ভয় দেখালেন, রাজি না হয়ে উপায় ছিল না।'

আমি এবার বুঝদারের মতো মাথা নাড়লাম। এরকম হতেই পারে। আমারও তো একই ব্যাপার। বাবার মর্যাদা রক্ষার্থে বিয়ে।

একটা ক্লান্তির হাই তুলে বললাম, তোমার যদি লাভার-টাভার থেকে থাকে তো তার নাম-ঠিকানা আমাকে বলতে পার। আজকাল কেউ মাইন্ড করে না। আমি তোমাকে ডিভোর্স তো দেবই, বিয়েও নিজের দায়িত্বে দিয়ে দেব।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিয়ের রাত্রিতেই এ ধরণের ডায়ালগ বোধহয় দশ বছর আগেও অভাবনীয় ছিল। এখনও অভাবনীয়, তবে কিনা যুগের হাওয়া পাল্টাচ্ছে। আমাদের ভাবাবেগ কমে যাচ্ছে।

গৌরীর চোখের চাউনীতে একটু শ্রদ্ধাবোধ ফুটল কি? ভাল করে দেখতে পেলাম না, তাকিয়েই নব-বধূর মতো চোখ নত করে ফেলল।

বোধহয় লাভারের কথায় ওই খুশি মেশানো লজ্জা। মুখে অবশ্য কিছু বলল না।

ঘুম হবে না জেনেও বালিশে মাথা রেখে শরীরটা ছেড়ে দিয়ে বললাম, তোমার সঙ্গে আমার কোনো ঘনিষ্ঠতার সম্ভাবনা নেই। একটু আত্মমর্যাদাও আছে আমার। তুমি নিশ্চিন্তে ওপাশে শুয়ে পড়তে পার।

গৌরী অবশ্য শুলো না। বসে রইল। আমিও খানিকক্ষণ এপাশ ওপাশ করলাম। তারপর উঠে বসে বললাম, না, ঘুম হবে না।

গৌরী মৃদুস্বরে বলল, আমি আপনার খুব ক্ষতি করলাম।

না, পুরুষদের তেমন ক্ষতি হয় না। ক্ষতি মেয়েদের। তোমার গায়ে বিয়ের স্ট্যাম্প বসে গেছে। কেন যে বোকার মতো কাজটা করলে। থাকগে, তোমাকে বাপের বাড়িতে রেখে আমি একা ফিরে যেতে পারি। তাতে অবশ্য ভীষণ গোলমাল লেগে যাবে। আর যদি আমাদের বাড়িতে যাও তবে আমি গোপনে ডিভোর্স এবং রি-ম্যারেজের ব্যাপারটা ম্যানেজ করতে পারি। কোনটা চাও ভেবে দেখ।

গৌরী মৃদুস্বরে বলল, দ্বিতীয়টাই ভাল।

পরদিন যথারীতি নানা রকম স্ত্রী-আচার সেরে গৌরী আমার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে চলে এল। বউ ভাতের অনুষ্ঠান সইল হাসিমুখে। উপহার নিল। সিঁদুর শাঁখা সবই পরল। ঘরের মধ্যে দু'জনেই শুভরাত্রির নিস্পৃহ রাত কাটিয়ে দিলাম। এবার জেগে নয়, ঘুমিয়ে।

বিয়ের পরই আবার আমি পাড়া উদ্ধারে নেমে গেলাম দ্বিগুণ উৎসাহে। বাড়ির সঙ্গে শুধু রাতটুকু ছাড়া সম্পর্ক চুকেই গেল। কারণটা খুবই সহজ। গৌরীকে আমার সান্নিধ্য থেকে বাঁচানো। গোপনে একজন উকিলের সঙ্গেও যোগাযোগ করলাম। উকিল ভরসা দিল, মিউচুয়াল হলে গোপনে অ্যানালমেণ্ট পেয়ে যাওয়া কষ্ট নয়।

গৌরীকে সবই জানালাম। তারপর বললাম, ডিভোর্সের কথা জানাজানি হলেই বিরাট গণ্ডগোল হবে। আমি বলি, ডিভোর্সের পিটিশন করার পরই তুমি সেই ছেলেটির কাছে চলে যাও। আমিও ক'দিন গা-ঢাকা দেবো। ভাবটা দেখাব দু'জনে একসঙ্গে বেড়াতে গেছি।

গৌরী হেসে বলল, অত তাড়া কিসের? কিছু দিন যাক।

তুমি ছেলেটার ঠিকানা এখনও আমাকে দাওনি কিন্তু !

দেব। সময় হলেই দেব।

এদিকে পাড়ায় লাইব্রেরি হয়ে গেল। কমিউনিটি সেণ্টার খুলে গেল। কাজ আরও বাড়ল। বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ করে হাই রাইজ অ্যাপার্টমেণ্ট তোলার জন্য টাকাওলা লোকেরা চেষ্টা করছিল। বস্তিবাসীরা নগদ টাকা পেয়ে ছেড়ে দিয়েছে জায়গা। আমি তাদের ঠেকালাম। বললাম, নগদ টাকা পাখা মেলে উড়ে যাবে। তার চেয়ে হাই রাইজের প্রোমোটাররা তোমাদের জন্যও কেন ওয়ান রুম ফ্ল্যাট বাড়ি করে দেন না ? এই নিয়ে আন্দোলনে নেমে গেলাম। কাজটাও হল।

এইভাবেই পাড়া এবং গোটা এলাকার এক অবিসংবাদী এবং অপরিহার্য একজন নেতা গোছের হয়ে উঠতে আমার কষ্ট হয়নি। কিছু পলিটিক্যাল উল্টো চাপ দিল, কিন্তু আমার রাজনৈতিক উচ্চাশা নেই বলে কোনো দলই আমার সঙ্গে শত্রুতা করেনি। বরং পরস্পর শত্রু দুটো দলের মধ্যে আমি বরং লিয়্যাজঁর কাজ করেছি সাফল্যের সঙ্গেই। নাগরিক সমিতিতে সব দলকেই সামিল করেছি।

সেদিন প্রায় মধ্যরাত্রি অবধি একটা মিটিং সেরে ফিরছিলাম। কিছুদূর অবধি সঙ্গীরা ছিল। বাড়ির গলির মুখ থেকে তারা গেল ভিন্ন রাস্তায়। আমি একা নিশ্চিন্তে ফিরছিলাম। অন্ধকার গলির মধ্যে আমি দুটো লোককে দেখতে পেলাম। দেয়ালে পিঠ দিয়ে নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কে রে ?

নিশ্চিন্তেই এগিয়ে গিয়েছিলাম। চেনা লোকই হবে। হয়তো কোনো কাজে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

কাজই। তবে অন্যরকম।

চাপা গলায় কে যেন বলল, শুয়োরের বাচ্চা ! নেতা বনেছে।

তার পরই মাথায় একটা শক্ত আঘাত। প্রথম ঘায়েই আমি লুটিয়ে পড়েছিলাম। তারপরও নিশ্চিত তারা আমার শরীরের ওপর কিছু লণ্ডভণ্ড কাণ্ড চালিয়েছিল।

জ্ঞান হল হাসপাতালে। দৃষ্টি ক্ষীণ, শ্রবণ ক্ষীণ, শরীর ক্ষীণ হাতটাও তুলবার মত শক্তি নেই। হাসপাতাল ভর্তি আমার শুভানুধ্যায়ীরা। দু'জন মন্ত্রী অবধি দেখে গেলেন আমায়। পত্রিকায়

খবর বেরোল, সমাজসেবী আক্রান্ত।

সেই ভীড়ে গৌরীও সামিল ছিল। চোখ উদভ্রান্ত, মুখে কারুণ্য। হতেই পারে। স্বামী না হলেও আমি ওর বন্ধু তো!

যখন মাসখানেক বাদে বাড়ি ফিরে এলাম তখন, বাড়ির সকলেই বলতে লাগল, দেশোদ্ধার যথেষ্ট হয়েছে। আর না। বাস্তু ঘুঘুর আস্তানায় হাত দিলে প্রাণ যাবে এরপর।

যারা মেরেছিল তারা ধরা পড়ল না। তবে আন্দাজে বুঝলাম খুব পরাক্রান্ত লোক। ভাড়াটে খুনী লাগানো কঠিন নয় তাদের পক্ষে। প্রথমটা ছিল ওয়ার্নিং। পরেরটা হবে একজিকিউশন। একটা বেনামা চিঠিও পেলাম এরকম জবানীতে।

বাড়ি ফেরার পর তৃতীয় রাত্রে গৌরী ঘন হয়ে বসল কাছে। বলল, তুমি কি বাইরের কাজ সত্যিই ছেড়ে দেবে?

বিস্মিত হয়ে বলি, না।

গৌরী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, বাড়ির কেউ চায় না তুমি আর রিস্ক নাও।

বাড়ির লোক কোনকালেই চাইত না।

তাহলে ছাড়বে না?

না। ইচ্ছে নেই।

আমিও তাই বলি। ছেড়ো না। তবে তোমার একজন সঙ্গী দরকার, নিজস্ব একজন সঙ্গী যে ছায়ার মত তোমার সঙ্গে ফিরবে। বিপদ ঘটতে দেবে না।

একটু হাসলাম। বললাম, সঙ্গী আমার অনেক। তবে ছায়া-সঙ্গী পাওয়া শক্ত। ভয় পেও না, কিছু হবে না। সঙ্গী পাওয়া শক্ত নয়। একজন রাজি আছে।

বিস্মিত হয়ে বলি, কে সে?

গৌরী ভারী চমৎকার একটু হেসে বলল, আমি।

আমি থম ধরে থাকি। তারপর বলি, কিন্তু তুমি ক'দিন? তোমার সেই লাভার--

গৌরী আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, তার প্রতি আমি বিশ্বাসঘাতকতা করে ফেলেছি। তাকে আমার মনেই নেই। আমি ভীষণ তরলমতি।

একটু হাসলাম মাত্র।

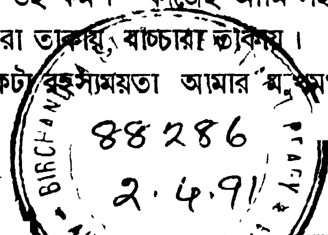
হয়ে ওঠা

নরম গাল দুটি যেদিন কোমল লালচে-কালো রোম রাজিতে ছেয়ে গেল সেই সময়ে একটু দুঃখ হয়েছিল। মানুষ নিজের কোনো আমূল পরিবর্তন প্রথমটায় সইতে পারে না। একটু সময় লাগে। সদ্যোজাত শিশুকে যাঁরা লক্ষ্য করেছেন তাঁরাই জানেন, সে কেবলই কুঁজো হয়ে চায়। ওই অবস্থায় মাতৃগর্ভে দশ মাস কাটিয়েছে সে। আচমকা এত আলো হাওয়ার খোলা পৃথিবীতে শরীর সটান রেখে মানুষ হতে প্রথমটায় চায় না।

দাড়িটা কামিয়ে ফেললেও হয়। কিন্তু আমার থুঁতনীতে একটা কুদর্শন কাটা দাগ আছে। বেড়াল তাড়াতে আমার দাদু খড়ম ছুঁড়ে মেরেছিলেন, বেড়ালের লাগেনি, আমার লেগেছিল। বিশ্রী দাগটা নিয়ে আমার যে হীনম্মন্যতা ছিল তা দাড়িতে আস্তে আস্তে ঢেকে যাচ্ছিল বলে আমি খানিকটা স্বস্তি বোধ করতে থাকি। কিন্তু বয়ঃসন্ধিতে দাঁড়িয়ে আমি যৌবনের দিকে চলেছি এটাও তো মস্ত এক ঘটনা। গলার স্বর ভেঙে মোটা হয়ে যাবেই। শরীরটা একটানে লম্বা হয়ে গেল। আমার এই ভাঙচুর ও পুনর্গঠন খুব বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি আমি। কেমন যেন নিজের সঙ্গেই নিজের একটা অপরিচয়ের দূরত্ব রচিত হয়। কোথায় হারিয়ে গেল সেই বালক আমি?

দাড়ি একটু কুটকুট করে, একটু সুড়সুড়ি দেয়। অনভ্যাসে একটু কেমন কেমন লাগে। তারপর সয়ে যেতে থাকে। তারপর একদিন দাড়ি কোচ্ছদ্য বলেই মনে হয়।

গোঁফ দাড়ি সমেত যৌবনের উপবনে আমার অনুপ্রবেশ খুব একটা অঘটন নয়। এরকম অনুপ্রবেশ অনেকেই ঘটায়। কিন্তু তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম। কাজেই আমি সহজেই লোকের দৃষ্টির শিকার হই। মেয়েরা তাকায়, বাচ্চারা তাকায়। একটু ভয় খায় কি? বুঝতে পারছি, একটা রহস্যময়তা আমার মুখমণ্ডলকে ঘিরে ধরেছে।



অনেকটা কালো চশমা পরার মতো। এই রহস্যময়তা আমার ক্রমেই প্রিয় হয়ে ওঠে। মানুষের এই এক স্বভাব। তার যত গুণই থাক আর যত প্রশংসাই জুটুক, তার সবচেয়ে প্রিয় কমপ্লিমেণ্ট হল রহস্যময়তা।

যৌবনের চৌকাঠে দাঁড়িয়েই যে মেয়েটাকে আমি প্রথম লক্ষ্য করি সে বাস্তবিক আমার নয়, আমার দাড়ির প্রেমে পড়েছিল।

ইতুর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল খুব সাধারণভাবে। পারিবারিক সূত্রে। দুই পক্ষেরই পরস্পরের বাড়িতে যাতায়াত ছিল। বালিকা ইতু অনেক ছেলের ভীড়ে আমাকে কোনওদিন তেমন লক্ষ্য করেনি। কিন্তু দাড়ি রাখার পর করল। একদিন হঠাৎ মুখের দিকে চেয়ে বিস্ময়ে বলে উঠল ও মা? তোমাকে যে চেনাই যায় না। আমি অপ্রতিভ ভাবে দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলি, কেন, খারাপ?

বিচ্ছিরি! এক্ষুনি কেটে ফেল।

বিচ্ছিরি হতে যাবে কেন? আমার তো বেশ লাগছে।

তোমাকে জংলির মতো দেখাচ্ছে।

মোটেই নয়।

বন মানুষের মতোও।

যাঃ। বন মানুষ তুমি দেখনি।

এই তো দেখছি।

যাই হোক, এর পর প্রতিদিনই ইতুর সঙ্গে আমার দেখা হত এবং কিছুটা সময় সে আমার দাড়ির পিছনে লাগত। আগাছা, জঙ্গল, আবর্জনা ইত্যাদি সবরকম অপমানই সে আমার দাড়ির উদ্দেশ্যে বর্ষণ করেছে। মাঝে মাঝে তখন আমার বাস্তবিকই দাড়ি কেটে ফেলতে ইচ্ছে করত। আত্মধিক্কার এবং অভিমানও বড় কম অনুভব করিনি।

কিন্তু মজা হল, এই দাড়ি নিয়ে আমাকে দু' কথা বলার জন্য ইতুকে রোজ আসতে হত। দুটি মিষ্টি চোখ ছিল তার, একটু শ্যামলা রং, লম্বাটে ছিপছিপে গড়ন। চট করে নজরে পড়ার মতো নয়, কিন্তু একবার নজর দিলে মনটা কিছুক্ষণ আটকে থাকে।

আমি যৌবনের উপবনে পা দিয়েই ফাঁদে পড়লাম ইতুর। কিন্তু ইতুর প্রেমিক আমি একা নই। সদ্য-যুবতী ও সুশ্রী এই কিশোরটীর কৃপাদৃষ্টি চাইত ফুটবল খেলোয়াড় সবুজ মিত্র, আঁকিয়ে শিল্পী বিপ্লব রায়, আরও অনেকে। যে রকমটা হয় আর কি। অভিনব

কিছু নয়। কিন্তু সে বয়সে বুকের ধকধক শব্দ, রক্তের উন্মত্ততা, সব মিলিয়ে মনে হত, ভালোবাসা যেন একটা হলকার মতো, কাজেই বনে আগুন লেগেছে, তার আঁচ এসে তপ্ত করে দিচেছ চারদিক। ইতুর চোখ জোড়া-প্রজাপতির মতো চারদিকে নেচে বেড়িয়ে স্থির হল অবশেষে আমার ওপর।

সে একদিন বলল, তোমার ভিতরে কী একটা আছে বলো তো! খুব গভীর, খুব রহস্যময়।

আমি দাড়িতে হাত বুলিয়ে ম্যাজিসিয়ানের মতো হাসতে চেষ্টা করলাম। যতদূর সম্ভব রহস্যময় সেই হাসি। ইতু মুগ্ধ হল।

সেই বছরই মাঘ মাসে আমার পৈতে। হারু নাপিত এসে গাড়লের মতো দাঁত ছরকুটে হেসে চোঁ চোঁ করে মাথা সমেত গাল কামিয়ে দিয়ে গেল। দৃশ্যটা খুব মন দিয়ে দেখছিল ইতু। খসে পড়েছে রহস্য, খসে পড়েছে ছদ্মবেশ।

দন্ডী ঘর থেকে বেরিয়েই বুঝলাম, একটা পৃথিবী হারিয়ে গেছে। ইতু আমার ছিল। এখন আর আমার নয়। দেবর্ষি রায় নামে আমাদের মফঃস্বল শহরে নবাগত ঘ্যাম স্মার্ট আর নায়ক-নায়ক চেহারার এক যুবকের সঙ্গে লটকে গেছে।

আমি জানি, দাড়ি না কামালে এই দুর্ঘটনা ঘটত না। কিছুতেই না। দাড়ির সঙ্গেই আমার রহস্যময়তা সাফ করে দিয়ে গিয়েছিল হারু নাপিত।

আমার এক ধরণের বৈরাগ্য এল। বিমর্ষতাও, মেয়েরা কী রকম হয় সে বিষয়ে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা তেমন কিছু নেই। এই প্রথম একটি মেয়ের কাছ থেকে প্রবঞ্চিত হয়ে আমার ভিতরে এক নিষ্ঠুর উদাসীনতা এল। মুন্ডিত মস্তক কর্তিত শ্মশ্রু আমি একটা আশ্রয় খুঁজতে লাগলাম। জপতপ সন্ধ্যাহ্নিক-এ। প্রবলভাবে গীতাপাঠ চলতে লাগল। আহার-বিহারে এল রীতিমতো বাছ-বিচার। বাড়ি শুদ্ধ লোক আমার এই নিষ্ঠা দেখে অবাক। এরকম তো এযুগে দেখা যায় না।

কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক মহেন্দ্র নাথ শাস্ত্রী মশায় স্বয়ং আমার পৈতের আচার্য ছিলেন। তিনিও আমার নিষ্ঠা দেখে রোজ আসতেন এবং আমাকে বিশুদ্ধ উচ্চারণে সংস্কৃত পড়তে শেখাতেন। ছাত্র খুব খারাপ ছিলাম না। সহজেই শিখতাম।

শেষে এমন হল যে আমার গীতা পাঠ শোনার জন্য দু'চারজন করে আসতে লাগল রোজ। তারা মন দিয়ে শুনত। এক একদিন এক একজন বলত, এর যে চেহারাতেই নিমাই-সন্ন্যাসের ছাপ দেখছি। কেউ বলত, ওঃ বাবা, এ যে একেবারে সাধু ব্রহ্মচারী মহারাজ।

হ্যাঁ, এই ভাবে, ঠিক এই ভাবে ছোট্ট শহরটায় আমার খ্যাতি খুব সহজেই ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বাড়তে লাগল বৃদ্ধ বৃদ্ধা ও বিধবাদের ভীড়। আমি মন দিয়েই পড়তাম এবং যথেষ্ট আবেগ অনুভব করতাম, শ্রোতারা অশ্রু মার্জনা করত।

একদিন সেই ভীড়ের মধ্যে দেখি, ইতু বসে আছে। অপলক চোখে চেয়ে আছে আমার দিকে। অলক্ষ্যে নিজের গালে হাত বোলাই। দাড়ি নেই। গোঁফ নেই। মাথায় টিকি এবং খোঁচা খোঁচা চুল।

সেদিন পাঠের শেষে সবাই চলে গেল, কিন্তু রয়ে গেল ইতু।

বড় বড় চোখে চেয়ে বলল, সাধু হবে নাকি? দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, পারলাম কই? সংসার বেঁধে রেখেছে। তবে হবো।

হবে! পারবে?

একটু হাসলাম, মানুষই তো সাধু হয়। পারব না কেন? ইতু একটু ভেবে বলল, পারবে জানি। তোমার চেহারার মধ্যে যেন একটা অলৌকিক পরিবর্তন এসে গেছে। গা দিয়ে যেন আলোর আভা বেরোচ্ছে। চোখ যেন স্বপ্নে ডুবে আছে। কেমন ভয় করে তোমাকে দেখলে। কিন্তু পায়ে পড়ি, সাধু হয়ো না।

কেন ইতু? আমি সাধু হলে তোমার ক্ষতি কী? ইতু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, সেটা তুমি কোনদিন বুঝবে না। শুধু বলি, হয়ো না, হয়ো না, হয়ো না, তুমি সাধু হলে আমি গলায় দড়ি দেবো।

এইসব রহস্যময় কথা বলে ইতু চলে যাওয়ার পর আমি অনেকক্ষণ ওর কথা ভাবলাম। আমার খুব ভাল লাগছিল ভাবতে।

পরদিনও ইতু এল। তার পরদিনও এল। রোজ সন্ধ্যাবেলা বুড়ো বুড়ি আর বিধবাদের মেল-এ সেও এসে জুটত।

একদিন দেখি, ডেনিস-জিনস পরা দুটো ছোকরাও এসেছে তার সঙ্গে। খুব চাপা বিদ্রূপের হাসি মুখে নিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে আমার পাঠ শুনছে বসে। বেশ স্মার্ট চেহারা। লম্বা চুল, ঝোলা

গোঁফ, অল্প দাড়ি। বেশ দেখাচ্ছে তাদের।

আমি চতুর্দশ অধ্যায় শেষ করার পর ছেলে দু'জনের একজন হাত বাড়িয়ে বলল, দিন তো বইটা একটু।

দিলাম। খানিকটা হতভম্ব হয়েই, বইটা বন্ধ করে হাতে রেখে ছোকরা প্রথম থেকে নিখুঁত উচ্চারণে এবং সামান্য সুর মিশিয়ে গীতা মুখস্ত বলে যেতে লাগল। ভারী মুগ্ধকারী পাঠ, অসাধারণ কন্ঠস্বর। তার চেয়েও বড় কথা, সে পাঠ থামিয়ে সহজ ভাষায় গীতার ভাষ্যও করে যাচ্ছিল।

তিনটি অধ্যায় সে আমাকে শুদ্ধ মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখে বইটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, গীতা আমার মুখস্ত। কিন্তু আমি নাস্তিক।

শুধু এইটুকু বলে ছেলেটা একটা ব্যঙ্গ হাসি হেসে উঠে পড়ল। দু'জনেই বিনা সম্ভাষণে বিদায় নিয়ে চলে গেল। আমার মুখটা গরম হয়ে উঠল লজ্জায়।

ইতুর দিকে চেয়ে দেখি, তার চোখ থেকে বিস্ময় খসে পড়ে গেছে। সে আমার দিকে ভ্রূ-কুঁচকে চেয়ে আছে।

সেই যে চলে গেল ইতু আর এল না। ক্রমে আমি গীতা পাঠ বন্ধ করে দিলাম। ভীড়টা আগেই পাতলা হতে শুরু করেছিল। কারণ একজন নাস্তিক আমার চেয়েও, অনেক সুন্দর করে গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করে গেছে আমারই ঘরে বসে।

বৈরাগ্যটা আর তেমন পীড়া দিত না। আমি একজোড়া ডেনিস জিনস প্যান্ট তৈরী করালাম। মাথায় চুল লম্বা হয়ে টিকি ঢাকা পড়ে গেল। ব্রহ্মচারী একদম হারিয়ে গেল। ইতু তখন সেই নাস্তিক ছেলেটির সঙ্গে মিলছে। তার নাম পীতম গোস্বামী।

ইতুর জন্য নয়, গীতার জন্যই পীতমের সঙ্গে আমার একটা শেষ লড়াই লড়তে হবে। কিন্তু আজকাল দ্বন্দ্ব যুদ্ধ নেই, স্বয়ংবর সভা হয় না। তবে কী দিয়ে লড়াই হবে?

শুনলাম পীতমের অনেক গুণ। তার মধ্যে যেটা সবচেয়ে বেশী সেটা হল, সে চমৎকার টেবিল টেনিস খেলে। কলেজের সিংগলস চ্যাম্পিয়ন।

টেবিল টেনিস সেই থেকে আমার ধ্যানজ্ঞান হল। কব্জীর মোচড়ে মোচড়ে হালকা বলটাকে ব্যাটের নানা জায়গায় লাগিয়ে বোর্ডে

ফেলতে লাগলাম বিদ্যুৎ বেগে। আমার পায়েও ছিল চমৎকার দ্রুত চলাফেরা, শরীর নমনীয়। পীতম শেক হ্যান্ড গ্রিপ-এ খেলে বলে আমি বললাম পেনহোল্ড গ্রিপ একটি পরিপূর্ণ অ্যাগ্রেসিভ গ্রিপ। মারের জোর যে রকম হয়, তেমনি দরকার শারীরিক দ্রুততা। কারণ এই গ্রিপ-এ ব্যাক হ্যান্ড মার বিশেষ নেই, বল বাঁ দিকে এসে সরে গিয়ে ফোর হ্যান্ডে মারতে হয়। ডিফেনসিফ স্ট্রোকও এই গ্রিপে ভাল হয় না। সুতরাং এভাবে খেলা রপ্ত করা করা একটু শক্ত, তবু হল।

সেবারকার চ্যাম্পিয়ানশিপে টুকটাক করে প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে আমি পেঁছে গেলাম ফাইন্যালে, ওপাশ থেকে পীতমও উঠল, ঠিক যেমনটা আমি চেয়েছিলাম।

খেলার দিন কমনরুম ভেঙে পড়ল ভীড়ে। ভীড়ের মধ্যে ইতু।

প্রথম গেমটায় একটু নার্ভাস ছিলাম আমি। অনেকগুলো স্ম্যাশ পড়ল টেবিলের বাইরে, পীতম গেমটা জিতে গেল কুড়ি আঠারোয়। বেশ হাততালি পেল সে। কিন্তু তার মুখ দেখে বুঝলাম, সে অস্বস্তি বোধ করছে। বুঝতে পারছে পরবর্তী খেলাটা খুব স্বস্তিকর নাও হতে পারে। হবে না আমি জানতাম।

দ্বিতীয় গেমের শুরু থেকেই আমার দুর্দমনীয় মারগুলো টেবিলে ঝড় তুলতে লাগল। একতরফা একরোখা অ্যাটাকিং গেম। পীতমের দিক থেকে যেরকম ফ্লাইটেই বল আসুক সেটাকে পেতে দিই আমি। এমন কি একটা লম্বা র‍্যালিও হল না। পাঁচ পয়েন্টে গেম খেল পীতম। অবিশ্বাস্য তৃতীয় গেম সে হারল প্রায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অভিভূতের মতো সাত পয়েন্টে। চতুর্থ গেম-এ হাল ছেড়ে দিয়েছিল। তার সারভিস পর্যন্ত চারবার নেট-এ লেগে ফিরে যায়। ফের চার পয়েন্টে সে গেম খেয়ে আমাকে চ্যাম্পিয়ানশিপ দিয়েছিল। হল ফেটে পড়ল উল্লাসে।

হাতে ট্রফি, জ্যোৎস্নারাতে আমি বাড়ি ফিরছিলাম, পাশে ইতু।

তুমি কি আমাকে ক্ষমা করবে?

কিসের ক্ষমা ইতু?

আগে বল করবে!

না জেনেই? তোমার অপরাধ কী?

আমি তোমার থৈ পাই না। কখন যে তুমি কি রকম হয়ে যাও!

কী হই ?

কখনো সাধু, কখনো সাহেব, কখনো চ্যাম্পিয়ান। আচ্ছা, তুমি কি বল তো !

কিছু একটা হতে চাই ঠিকই, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না সেটা কী।

সেবার জেলা চ্যাম্পিয়ানশিপে নন্দন স্বামী নামে একটি দক্ষিণ ভারতীয় দলে খেলতে এসে পেনহোল্ড গ্রিপ-এ ভেল্কি দেখিয়ে আমাকে স্টেট গেম-এ হারাল।

কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। আমি টেবিল টেনিসে বিশ্বচ্যাম্পিয়ান হওয়ার চেষ্টা করিনি, অথবা সেটাই আমার শেষ কথা নয়। যৌবনের মধ্যাহ্নে দাঁড়িয়ে আমি আমার নানা সামর্থ্যের একটা হিসাব নিকাশ করছিলাম মাত্র। আমার চারিদিকে মাপা পথ, হরেক রকম রোড সাইন। আমি কোন দিকে যাব ?

যেদিকেই যাই আমার লক্ষ্য দাঁড়িয়ে গেল ইতু। একজন যুবকের কাছে একজন যুবতী, আমি চাই তার স্তুতি, তার গুণমুগ্ধতা, তারপর তার হৃদয়।

নন্দন স্বামীর কাছে আমি হেরে যাওয়ার পর ইতু কয়েকদিন দেখাই করতে এল না আমার সঙ্গে। সে তখন শুধু রেকর্ড চালিয়ে গান শুনত।

এর কিছুদিনের মধ্যেই দেবর্ষি রায় আই. এ. এস-এ সিলেকশন পেয়ে যায়। যা অবধারিত তাই হল। আবার তার সঙ্গে জমে উঠল ইতু। বিয়ের কথা আভাসে ইংগিতে চালাচালি হচ্ছিল।

আমার কিছু করার ছিল না, অপেক্ষা করা ছাড়া, তবে খুব বেশী দিন অপেক্ষা করতে হয়নি আমাকে। দেবর্ষি যখন ট্রেনিং শেষ করে ম্যাজিস্ট্রেট না কী একটা উঁচুপদে যোগ দিয়েছে ততদিন আমিও সিলেকশন পেয়ে গেছি এবং দেবর্ষির চেয়ে বহুগুণ ভাল ফল করে আমি পেয়েছি ফরেন সার্ভিস।

ইতু ছুটে এল, ফের তুমি ?

আমি কি ?

তুমি সারা জীবন আমাকে জ্বালিয়ে মারবে ?

কেন ইতু জ্বালাবো কেন ?

কেন জানো না ?

না। আমি জানি আমার কিছু হওয়ার আছে। এই মাত্র।

ইতু সজোরে মাথা নেড়ে বলল, না না না, তুমি আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারতে চাও।

তোমার পথ তো খোলা ইতু।

কে বলল খোলা? আমার সব পথ আটকে বারবার তুমি উদয় হও, কেন?

আমি সজোরে মাথা নেড়ে বললাম, আমার সব পথ তুমিই বা আটকাও কেন?

তাহলে পথের বাধা সরাও।

কী করে সরাব ইতু।

জানো না?

জানি, কিন্তু সেটা তোমাকে একরকম মেরে ফেলা ইতু, সে আমি পারব না।

তুমি ভীষণ অদ্ভুত।

হ্যাঁ, আমি রহস্যময় হতে ভালবাসি।

ইতু চলে গেল, কাঁদতে কাঁদতে, হাসতে হাসতে।

এর পরের বার ইতু যখন আমার মুখোমুখি হল তখন তার মাথায় সিঁথিমৌড়, হাতে বরণমালা, চোখে সলজ্জ দৃষ্টি। আমি আর ইতু এখন বিদেশী শহরে থাকি। চমৎকার শহর, চমৎকার আছিও আমরা। আমার সম্পর্কে ইতুর বিস্ময় শেষ হয়েছে, নির্ভরতা এসেছে। তার স্বামী দায়িত্বশীল উচ্চপদে আসীন, রাসভারী।

কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয় ইতুর জন্যই আমি আজো অনেক কিছু হয়ে উঠতে পারতাম। ওর চোখে নতুন নতুন বিস্ময় কাটানোর জন্য আমি না পারতাম কী? কিন্তু আর তো কিছুই দেওয়ার নেই ইতুকে। আর কিছুতেই সে বিস্ময় ফুটবে না ওর চোখে।

ইতু নয়, মরে গেছি আমিই, ইতুকে পেয়ে।

শরীর

কুসুমপুরের ফটিকবাবুর গোঁফ দেখেই প্রথম মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল রমেশ। ফটিকবাবুর সবই অবশ্য ভাল। কোঁকড়া চুলের টেরি, কুঁচোনো ধুতি আর গিলে করা পাঞ্জাবির কথা বাদ দিলেও ফটিকবাবুর আরও মেলা জিনিস আছে। পেটানো শরীর, ফর্সা রং, কার্তিকঠাকুরের মতো মুখখানা। আর নাকের নিচে ওই গোঁফখানা; সমান করে ছাঁটা নাকের তলায় কিছু চওড়া, আস্তে আস্তে সরু হয়ে দুপাশে এসে একটু মুচড়ে কাঁকড়াবিছের হুলের মতো ওপর পানে উঠে ফের একটু ঢলে পড়েছে। এ জিনিস আর কারও দেখেনি রমেশ। গোঁফ রাখতে হলে ওই ফটিক-গোঁফ।

মাস তিনেকের চেষ্টায় হুবহু না হলেও অনেকটা ওরকমই হয়ে উঠতে লাগল রমেশের গোঁফখানা। বেগমহাটির নাড়ু শীলের সেলুনে একদিন হানা দিল রমেশ।

নাড়ুদা, খুব সাবধানে গোঁফটা ছেঁটে দিতে পারবে? শুধু ডগাটা ছেড়ে দিও। ডগাদুটো চুমড়ে ওপরে উঠবে।

নাড়ু বিড়ি টানছিল। রমেশের মতো চ্যাংড়াদের তার পাত্তা দেওয়ার কথা নয়। খুব তুচ্ছতাচ্ছিল্য দেখিয়ে বলল, যা একখানা কষ্টিপাথরের মতো গায়ের রং তোর, গোঁফটা দেখবে কে? টর্চ না জ্বাললে যে ঠাহর পাবে না লোকে।

একথায় ভারী অপমান লাগল রমেশের। তবে কথাটা মিথ্যেও নয়, গায়ের রং তার হাকুচ কালো।

নাড়ু বিড়ি খেতে খেতে কাঠের চেয়ারটায় বসে হাঁটু নাচাতে নাচাতে বলল, অত সরু মুখে কি আর চোমরানো গোঁফ মানায় রে! ওসব বাহারে গোঁফের জন্য ভরাট মুখ চাই, একটু মাজা রং চাই। বুঝলি! তা গোঁফ ছাঁটতে সেলুনের কী দরকার? গোবিন্দর দোকান থেকে একখানা ছোট কাঁচি কিনে নে। নিজেই বসে বসে ছেঁটে নিবি।

নাড়ু শীলের সেলুন থেকে এই অপমান সয়ে ফিরে এল রমেশ। কথাটা ঠিকই। ফটিকবাবু হতে গেলে শুধু গোঁফ হলেই চলবে না। বাকিগুলোও চাই।

সরু মুখের কথাটাও তার খেয়াল ছিল না। রমেশ এমনিতেই রোগাটে চেহারার মানুষ। তার ওপর মুখখানা একেবারে নরুণের মতো। চেহারা নিয়ে বড্ড মুষড়ে পড়ল রমেশ। এই চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স অবধি চেহারা নিয়ে তার কোনও ভাবনা ছিল না। কেউ খোঁটাও দেয়নি কখনও। আসলে ভাল করে লক্ষ্যও করেনি কেউ তাকে।

রাধাপুরের কুঞ্জ হালদারের মেয়ের বিয়েতে রমেশ গিয়েছিল ম্যারাপ বাঁধতে। সেখানেই সন্ধেবেলা ফটিকবাবুকে ভাল করে লক্ষ্য করল সে। হ্যাঁ বটে, গোঁফখানাই তো শুধু কথা নয়, গোঁফের জন্য মুখ চাই, গায়ের রং চাই। ফটিকবাবুর গায়ে একখানা মুগার পাঞ্জাবি, তাতে সোনার বোতাম আর ধুতির বাহারও দেখবার মতো। মিহি কুঁচিতে জরির পাড় আর মুগের চওড়া ধাক্কা—যা খুলেছে তা বলার নয়। ফটিকবাবুকে দেখে মেয়েমহলে একটা হুলুস্থুল পড়ে গেল। একধারে দাঁড়িয়ে হ্যাজাকের আঁচ গালের ওপর লাগা সত্ত্বেও হাঁ করে ফটিকবাবুকে দেখল রমেশ। হ্যাঁ, গোঁফটা কোনও কথা নয়। ফটিকবাবুর সব মিলিয়েই ফটিকবাবু।

শেষ ব্যাচে খেতে বসে রমেশের মুখে খাবার দাবার বিস্বাদ ঠেকছিল। বমি উঠে আসছিল গলায়। জল গিলে উঠে পড়ল। সে মজুমদার ডেকোরেটরের লোক। কাল দুপুরে ম্যারাপ খুলে টেম্পোতে তুলে তবে ফিরবে। ম্যারাপের একধারে ত্রিপলের ওপর শুয়ে অনেক রাত অবধি জেগে রইল রমেশ। ম্যারাপের কোণায় একটা ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছিল। মাথার পিছনে হাত রেখে শুয়ে থেকে হাঁ করে আকাশ দেখতে লাগল রমেশ আর ভগবানের অবিচারের কথা ভাবতে লাগল। ভগবান সবাইকে সমান চেহারা, সমান টাকা, সমান গায়ের জোর কিছুই দেয় না। এটা রমেশের কাছে ভারী অন্যায় বলে ঠেকতে লাগল।

ফটিকবাবুর সঙ্গে ফের দেখা হল শিবপুরে বিনোদিনী শিল্ড ফাইনালের দিনে। শিবপুর বুলেট ক্লাবের সঙ্গে বেগমহাটির মিতালী সঙ্ঘের খেলা। মেলা লোক জমে গেছে চারধারে। একধারে

সাদা চাদরে ঢাকা টেবিলের ওপর মস্ত শিল্ড। পেছনে একটি চাঁদোয়া, তার ছায়ায় গণামান্য লোকেরা ফোল্ডিং চেয়ারে বসা। তাদের একজন হচ্ছে ফটিকবাবু। গায়ে গেরুয়া পাঞ্জাবি যেন আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে চারধারে। ধুতির বদলে পায়জামা। ফটিকবাবু মিষ্টি মিষ্টি হাসছে। রমেশ দেখল চারধারে এত লোক, তবু তার মধ্যে ফটিকবাবু যেন গোবরে পদ্মফুলটি হয়ে ফুটে আছে। মজুমদার ডেকোরেটর্সের সাইনবোর্ডখানা বাঁশের গায়ে লটকাতে গিয়ে আনমনা রমেশ হাতুড়ির ঘা পেরেকের মাথায় বসাতে পারল না ঠিকঠাক, বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা ছেঁচে গেল। কিন্তু আঙুলের টাটানির চেয়েও ভগবানের অবিচারের টাটানি অনেক বেশি হচ্ছিল বুকের মধ্যে।

বেগমহাটির বিষ্ণুপদ ঘোষের মেয়ে সরস্বতীর কালো রঙের জন্য বিয়ে হয়ে উঠছিল না। বিষ্ণুপদর বউ কোন এক কবরেজকে ধরে নাকি একমাস চিকিৎসা করিয়ে রং ফর্সা করেছিল। সরস্বতীর বেশ ভাল বিয়ে হয়ে যায়। কবিরাজের ঠিকানাটা জোগাড় করেছে রমেশ। এ তল্লাটের সবচেয়ে বড় গঞ্জ রামনগরে থাকে। বুড়ো মানুষ। এমনিতে রুগী-টুগী দেখে না আজকাল। তবে গিয়ে কেউ ধরে পড়লে উদ্ধার করে দেয়। হরেন কবিরাজ বললে যে-কেউ বাড়ি দেখিয়ে দেবে।

ডেকোরেটরের কাজে নানা জায়গায় ঘোরে রমেশ। রামনগরের পাশেই একটা বিয়েবাড়িতে ম্যারাপ বাঁধতে গিয়ে ধাঁ করে রামনগরে হাজির হল। বেশি জিজ্ঞেস করতে হবে না। বাজারের উত্তরদিকে পুরোনো শিবমন্দিরের পিছনে বাড়ি। দেড়শ বছরের পুরোনো বাস।

বাড়ি দেখে রমেশের বুক টিপ-টিপ করতে লাগল। বিশাল বাড়ি। পেল্লায় পেল্লায় সব থাম, মস্ত বাঁধানো চন্ডীমন্ডপ, চাতাল, বারান্দা, দর-দালান। এ বাড়িতে যার বাস সে পয়সাওলা লোক, আর পয়সাওলারা কেন রমেশকে পাত্তা দেবে?

চন্ডীমন্ডপের তিনচারজন বুড়ো মানুষ বিকেলের দিকে জড়ো হয়েছে। রমেশ আগু হবে না পেছাবে ভেবে না পেয়ে নারকোল গাছের গুঁড়ি ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। একটা মুনিশ গোছের লোক যাচ্ছিল পাশ দিয়ে, রমেশ জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ গো, কবরেজমশাইকে পাওয়া যাবে?

ওই তো বসে আছে। যাও না, সামনে যাও।

মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে শেষ অবধি যখন চন্ডীমন্ডপের ধার ঘেঁষে গিয়ে সে দাঁড়াল তখন বুড়োদের মধ্যে একজন বেশ চড়া গলায় বলে, কী চাই হে ?

আজ্ঞে, কবরেজমশাইয়ের কাছে আসা।

কী দরকার ? আজকাল আর আমি নিদান-টিদান দিই না। আমার ছেলেই ওসব দেখে। বাজারের দক্ষিণে শিবকালী আয়ুর্বেদ আছে, সেখানে যাও।

আজ্ঞে আপনার কাছেই আসা।

কবরেজমশাইয়ের চেহারাখানা পাকা কলাটির মতো টুসটুসে। আশির ওপর বয়স, দেখে বুঝবার উপায় নেই। মাথায় এখনও বেশ ঘন কাঁচাপাকা চুল। রমেশের কথায় ভ্রূ কুঁচকে এমন বিরক্ত ভাব প্রকাশ করল যে, রমেশ পালাতে পারলে বাঁচে। তবে পট করে মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে সোজা শানের ওপর উপুড় হয়ে ঢিপ করে একটা প্রণাম ঠুকে দাঁড়াল।

হরেন কবিরাজ এতে খুশি হল কি না বোঝা গেল না। তবে কোঁচকানো ভ্রূ সটান হল। বলল, আমার কাছে এলেই তো হবে না বাপু। রোগভোগের ব্যাপার হলে আমার কাছে সুবিধে হবে না।

আজ্ঞে রোগের ব্যাপার নয়।

তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। তা দরকারটা কী ?

একটা কথা খুব মনে হচ্ছে কদিন ধরে। বলছিলাম কি, মানুষের গায়ের রং কি কখনো কালো থেকে ফর্সা করা যায় ?

হরেন কবিরাজ একটু হাঁ করে চেয়ে থেকে বলে, কালো থেকে ফর্সা ? কেন বাপু, ভগবানের দেওয়া গায়ের রং বদলাতে যাবে কেন লোকে ? খোদার ওপর খোদকারি করতে হবে কেন ?

শুনেছিলুম সরস্বতী বলে একটা মেয়ের গায়ের রং আপনি নাকি কালো থেকে ফর্সা করে দিয়েছিলেন ?

বুড়োরা সবাই খুব মন দিয়ে রমেশকে দেখছে। রমেশ একটু একটু অস্বস্তিবোধ করছে।

হরেন কবিরাজ মৃদু একটু হেসে বলে, ওটা বাজে কথা। লোকে না বুঝে রটিয়েছে। সরস্বতীর লিভারের দোষ ছিল। তাই থেকে গায়ের রং কেমন কালচে মেরে যায়। আমি তার লিভারের চিকিৎসা করেছি, তাইতেই চামড়ার আসল রং ফুটে ওঠে। কালোকে ফর্সা

করা আমার কাজ নয় বাপু। এখন এসো গিয়ে।

বুড়োদের একজন ফস করে জিজ্ঞেস করে বসে, তা কার রং ফর্সা করতে চাও বাপু?

রমেশ মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে বলে, সে আছে একজন।

ফর্সা ফর্সা করে কেন যে লোকে অত হেদিয়ে মরে বুঝি না বাপু। কালো ধলো নিয়ে কেন যে এত বায়নাক্কা।

রমেশ একটু ঘাড় চুলকালো। তারপর বলল, তা যদি সেই লিভারের ওষুধটাই দেন তাহলেও হয়। চেষ্টা করে দেখি।

হরেন কবিরাজ একটু খ্যাঁক করে উঠে বলে, লিভারের ওষুধ দিলেই হল? রুগী না নেড়ে ঘেঁটে, না বুঝে ওষুধ এনে দিলেই হয় বুঝি! এখন যাও তো, বিরক্ত কোর না।

রমেশ বুঝল, সুবিধে হবে না। একটু ঘাড়-টাড় চুলকে "তাহলে আমি গিয়ে" বলে পিছু হটে চলে এল। তবে ক্ষীণ একটা আশা সে ছাড়তে পারল না।

রামনগরের বাজার বিখ্যাত, একধারে রামনগর কালীবাড়ি, অন্য ধারে হরিপুরের নিকাশী খাল, মাঝ বরাবর বিশাল এলাকা নিয়ে রমরম করছে বাজার। সাত আটটা গাঁয়ের ব্যাপারী পাইকারি বাজার করতে এখানেই হানা দেয়। হাইওয়ে থেকে মাইল দুইও হবে না। দিনে রাতে লরি আর টেম্পো আসে যায়। বাজারে কিছুক্ষণ আনমনে ঘুরে বেড়াল রমেশ। চারধারে কালো মানুষ, ফর্সা মানুষ, তামাটে মানুষ, নোংরা মানুষ, পরিষ্কার মানুষ, ঘেমো মানুষ, রাগী মানুষ, মতলববাজ মানুষ। তবে রমেশের এখন এমন হয়েছে যে ফর্সা দেখলেই তাকিয়ে থাকে, আহা, লোকটার কত ভাগ্য।

শিবকালী আয়ুর্বেদের উল্টো দিকে একটা মিষ্টির দোকানে বসে রমেশ গরম জিলিপি খেল। শিবকালী আয়ুর্বেদ নিতান্তই হতশ্রী দোকান। একজন চশমা-চোখে মাঝবয়সী লোক বসে মাছি তাড়াচ্ছে। খদ্দের নেই। কালো শুকনো চেহারার লোকটিকে দেখে ভরসা হচ্ছে না বড় একটা, তবু হরেন কবিরাজের ছেলে তো, হয়তো জানে মেলা।

বুকটা ঢিবঢিব করেই যাচ্ছে। দোকানের দরজায় উঠে সে একটু গলা খাঁকারি দিল। কবরেজের ছেলে চেয়ারে পা তুলে একটা ব্লেড

দিয়ে পায়ের কড়া কাটছিল। মুখ তুলে বলে, কি দরকার ?

রমেশের পোশাক-আসাক কিছু খারাপ নয়। টেরিলিনের পাতলুন, গায়ে গোলাপী জামা, তবু সে লক্ষ্য করেছে ভগবানের মার চেহারাখানার জন্যই যেন তাকে দেখলেই লোকের বিরক্তি আসতে চায়।

রমেশ, কবিরাজের উল্টোদিকের চেয়ারে বসতে গিয়েও কেন যেন সাহস পেল না। চেয়ারের পিঠ ধরে দাঁড়িয়ে বলল, আজ্ঞে আমার লিভারটা বড্ড খারাপ।

হরেন কবিরাজের ছেলে ব্যোমকেশ কবিরাজ ব্লেডখানা যত্ন করে খাপে ভরে টেবিলে পাতা রেক্সিনের তলায় ঢুকিয়ে রেখে সোজা হয়ে বসে বলে, বোসো।

রমেশ বসল।

ব্যোমকেশের মুখে বেশ একটা খুশি খুশি ভাব। মাথা নেড়ে বলল, মেলা অ্যালাপাথ চড়িয়ে এসেছো তো? আগেই জানি, লিভারের বারোটা বাজলে তবেই লোকে এই বান্দার কাছে আসে। তা তোমার অসুবিধেটা কী হচ্ছে।

রমেশ অকপটে বলে, এই তো দেখুন না, গায়ে কেমন কালো কালো ছোপ ধরে যাচ্ছে। সবাই বলে লিভারের ব্যামো।

কালো ছোপ! কই দেখি!

বলে একটু ঝুঁকে হাত গা গলা একটু লক্ষ্য করল ব্যোমকেশ, তারপর বলল, ছোপ-ধরা তো মনে হচ্ছে না। এ তো একেবারে একঢালা পাকা রং।

রমেশ অস্বস্তিতে পড়ে আমতা আমতা করে বলে, লোকে বলে, ইদানীং নাকি বড্ড কালচে মেরে যাচ্ছি।

ভাল করে দেখতে হবে। দেখি, হাতের নখ দেখি, ···হুঁ··· চোখের পাতা···হুঁ···জিব···হুঁ

রমেশ বুকের ঢিবঢিবানি নিয়ে বসে রইল চুপচাপ।

ব্যোমকেশ বিরস মুখ করে বলল, লিভারের অবস্থা মোটেই সুবিধের নয়। মাস দুই টানা ওষুধ খেয়ে যেতে হবে। কেমন খরচাপাতি করতে পারবে? হরেন কবরেজের পাঁচনের দাম কিন্তু একটু চড়া। দেওঘর, হরিদ্বার, হিমালয়ের কাঁহা কাঁহা মুলুক থেকে আমাদের গাছ-গাছড়া সব আসে।

আজ্ঞে, কিরকম খরচ হবে?

আজকে একখানা বড় বোতল দিয়ে দিচ্ছি। এবেলা ওবেলা খালি পেটে খেতে হবে। আঠারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

রমেশ মজুমদার ডেকরেটার্স থেকে মোট সাড়ে তিনশো টাকা বেতন পায়। বাপের সামান্য চাষবাষ আছে বলে ভাতের টানটা পড়ে না। তবে টানাটানিরই সংসার। আঠারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা হুট করে বের করে ফেলা বড় সহজ নয়। আর ক্ষীণভাবে সে এটাও টের পেল যে, হরেন কবিরাজের ছেলে তার বাপের মতো মোটেই নয়। এ লোকটা তাকে ভোগা দিতে চাইছে।

কুড়ি টাকার একটা নোট দিয়ে দেড় টাকা আর এক বোতল পাঁচন ফেরৎ পেল রমেশ।

পরদিন দুপুরে যখন বাড়ি ফিরল রমেশ তখন তার হাতে বোতল দেখে মা আঁতকে উঠল, তোর হাতে কিসের বোতল রে? তাড়ি ধরেছিস নাকি?

রমেষের চাষী বাপ সবে মাঠ থেকে বাড়ি ফিরে দাওয়ায় বসে হাতপাখায় হাওয়া খাচ্ছে। ছেলের দিকে গম্ভীর হয়ে তাকাল।

রমেশ চিনচিনে গলায় বলে, লিভার খারাপ বলে রামনগরের কবিরাজমশাই ওষুধ দিলেন।

দেখি, বলে বাপ হাত বাড়াল। ছিপি খুলে গন্ধটা শুঁকে বলল, এ তো একেবারে কাঁচা ধেনো।

রমেশ প্রতিবাদের ভাষা খুঁজছিল। বাপকে সে কিছুটা সমঝে চলে। চণ্ডাল রাগ আছে তার বাপের। তবে কিছু বলতে হল না তাকে। বাপ বোতলটা পাশে রেখে বলল, রামনগরের ব্যোমকেশ কবরেজ তো। শালা আবার নিদেন হাঁকে। পেটে কানাকড়ি আয়ুর্বেদ নেই। বাপ চায় তার জায়গায় ছেলেকে চেপে বসাবে। আর অকাল-কুষ্মাণ্ডটা বাপের বিদ্যে জলাঞ্জলি দিয়ে কবরেজি বোতলে ধেনো ভরে বেচে। কত দাম নিয়েছে?

রমেশ বানিয়ে বলল, দশ টাকা।

ইস। গালে থাপ্পড়, পাঁচ টাকা বারো আনা বাঁধা দাম। এটা রইল আমার কাছে। আর তোর যে লিভার না কী খারাপ হয়েছে সেটা ওই গবেট বুঝলে কী করে? রোজ সকালে কুলেখাড়ার রস, আনারসের পাতার গোড়া ছেঁচে থেঁতো করে কয়েক ফোঁটা চুনের জল আর কালমেঘ খেলেই লেভার নেচে উঠবে। দশটা টাকা জলে গেল।

অল্পের ওপর দিয়ে ফাঁড়াটা কাটল রমেশের। কিন্তু বোতলটা হাতছাড়া হল। সন্ধেবেলা তার বাবা সেই পচাঁন গিলে দিব্যি নেশা জমিয়ে ফেলল।

সাড়ে আঠেরো টাকার জন্য বুকটা অনেকক্ষণ খচ খচ করল রমেশের। রাত্তিরে টেমির আলোয় নিজের মুখখানা ভাল করে দেখল রমেশ। সে কালো তাতে সন্দেহ নেই, তবে মুখখানা কতটা সরু তা তার হিসেবে এল না। আছাঁটা গোঁফ বেশ বেকায়দা রকমের পুষ্ট হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, নাড়ু শীলের ওই অপমানের পর আর গোঁফে হাত দেয়নি সে।

ফটিকবাবুর চেহারাখানার সবচেয়ে চোখে পড়ার জিনিস হল পেটানো শরীর। লম্বায় ফটিকবাবু যে খুব একটা উঁচু তা নয়। তবে বুকের ছাতি আর হাতের গোছ বেশ ভাল। এ জন্মে আর ফটিকবাবুর মতো হয়ে ওঠা হবে না মনে করে বুকটা বড় দমে যায় রমেশের। আর ভগবানের ওপর খুব রাগ হয়। একখানা ভাল চেহারা থাকলে হাটেবাজারে বিয়েবাড়িতে কি জমায়েতে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে কত সুখ! তা ফটিকবাবুর মতো পুরোপুরি হওয়া না গেলেও খানিকটা তো হতে পারত রমেশ!

নিশুত রাতে স্বয়ং ভগবান এসে গেলেন রমেশের স্বপ্নে। এক গাল হেসে বললেন, বর-টর নিবি নাকি?

রমেশ দেখে ভগবানের মুখে ফটিকবাবুর মুখ বসানো। সেই বাবরির মতো চুল, সেই ফর্সা রং আর সেই গোঁফ। তবে পোশাকটা একটু অন্য ধারা। গায়ে একটা নামাবলি, পরণে পট্টবস্ত্র। রমেশ ঘাড় চুলকে বলে, আজ্ঞে যদি চেহারাখানার একটা কিছু করে দেন তো বড় ভাল হয়। মনে বড় কষ্টে আছি।

ভগবান বললেন, চেহারা নিয়ে করবিটা কি তুই? যাত্রায় নাচবি নাকি?

জিব কেটে মাথা নেড়ে রমেশ বলে, আজ্ঞে না।

তাহলে কি কোনও মেয়েছেলেকে পটাবি?

রমেশ লজ্জায় মাথা নুইয়ে ফেলে বলে, আজ্ঞে সে সব হবেখন। এমনিই চেহারাটা হলে বেশ বুক ফুলিয়ে বেড়ানো যায়।

ভগবান একটু ভাবিত হয়ে বলেন, তা ভাল চেহারাও তো নানারকম

হয় রে? তুই কোন রকমটা চাস?

আজ্ঞে ঠিক ফটিকবাবুর মতো। আচ্ছা ভগবানমশাই ইয়ে ভগবান ঠাকুর, তা আপনাকে দেখতে অনেকটা কেন ফটিকবাবুর মতোই?

ভগবান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমার কি আর চেহারা বলে কিছু আছে রে! রূপই নেই। এই যে আমার চেহারা দেখছিস এ হল ফক্কিকারি। তুই ফটিকবাবুর চেহারা পছন্দ করিস বলে ওই চেহারাই ধরে এলুম।

এইসব কথা রমেশ যেন কোথায় আগেও শুনেছে। হরু ঠাকুরের ভাগবত পাঠের আসরে, নয়তো ভজগোবিন্দপুরের সেই বৃন্দাবনলীলায় বা আর কোথাও। রমেশ মাথা নেড়ে বলে, যে আজ্ঞে, বুঝে গেছি।

বুঝবি না কেন? বুদ্ধিসুদ্ধি তো তোর কিছু খারাপ নয়। তাহলে চেহারা হলেই তোর চলবে তো?

আজ্ঞে, আগে ওটাই হোক। কথায় আছে আগাড়ি দর্শনধারী—

ভগবান খুব হাসলেন। ওরে আহাম্মক, খুব তো কথা জানিস দেখছি। ভেবেছিস বুঝি রোজরোজ এসে তোকে বর দিয়ে যাব! ওটাই হোক কথাটার মানে কি রে হতভাগা?

রোজ না হোক মাঝেসাঝে আসবেন তো?

দুনিয়ায় কত কোটি লোক আছে জানিস? তাদের দেখাশুনো করতে হয় না? এক রমেশকে নিয়ে থাকলে কি আর আমার চলে রে? তাহলে ওই কথাই রইল।

মনে থাকবে তো আজ্ঞে! অন্যদের সঙ্গে আমারটা গুলিয়ে ফেলবেন না তো ভগবানঠাকুর?

ওরে না। আমার জাবদা খাতায় সব লেখা থাকে।

তবে কবে থেকে ব্যাপারটা হচ্ছে?

দেখি। দুম করে তোকে ফটিক বানালে যে লোকে তোকে চিনতে পারবে না। আর দুটো ফটিক ঘুরে বেড়ালে লোকে ভুলও করবে।

রমেশ আব্দারের গলায় বলে, সেসব গণ্ডগোল আমি ঠিক সামলে নোবখন। এ বাড়ির লোক আমাকে না চিনলেও ক্ষতি নেই। আমি অন্য বন্দোবস্ত দেখে নেবো। আর দুটো ফটিক নিয়ে একটা গোলমাল পাকাতে পারে বটে, আমাকে ফটিকবাবুর চেয়েও আর একটু সরেস করে দেন না?

ভগবান চোখ কপালে তুলে বলেন, আরও সরেস! বলিস কি!

ফটিককে বানাতেই আমার কালঘাম ছুটে গেছে বাপ। ওই নাক চোখ মুখ কুঁদে কুঁদে বানানো কি চাট্টিখানি কথা! গায়ে ডবল রং পালিশ।

তাহলে আর বর দেওয়ার কী মানে হয় বলুন! না হয় নাকটা একটু মোটাই রইল, রংটাও না হয় এক পোঁচ কমই দিলেন, আর কপালটা অত গড়ানে না হলেও চলবে। এবার হবে তো! কত সুবিধে করে দিলুম বলুন।

ওরে ডাকাত, যা চাইছিস তাও কি কিছু কম রে! দাঁড়া, ভেবে দেখি, এসব তো রাতারাতি হয় না।

আজ্ঞে, ভাবাভাবির মধ্যে গেলে আবার সব চলে যাবে। বন্দোবস্ত যা করার এখনই করা ভাল। পাকা কথা না হয়ে গেলে মুশকিল। আপনি ফের দোটানায় পড়ে যাবেন।

না রে না, ভগবান হওয়া কি মুখের কথা। আর দোটানা কি বলছিস, আমার টান হাজারো, লাখো, কোটিক। তোর শুধু চেহারা হলেই খালাস, বেগমহাটির পঞ্চানন কি চায় জানিস? হরিপদর ওলাওঠা হোক, তাহলে তার ছুকরি মাগকে সে ভাগিয়ে নিতে পারে। রামনগরের সন্নিসি দাস পাঁচ কোটি টাকা চাইছে সেই কবে থেকে। কুঞ্জনগরের গোবিন্দ কাল থেকে ধরে পড়েছে তার কেলে গরুর পেট ছেড়ে দিয়েছে, পেট ভাল করে দিতে হবে। ল্যাটা কি একটা?

এসবই রমেশের জানা। কানাঘুঁষো শুনেছে। সে মুখ গোমড়া করে বলে, আপনি কিন্তু বর দিয়েই বড্ড দর কষাকষি লাগিয়ে দিয়েছেন ভগবানঠাকুর। কত সুবিধে করে দিলুম, তাও যদি গাল না ওঠে তাহলে আর আপনার মহিমাটা থাকল কোথায়?

ওরে অমন রাগবাগ আমার ওপর সবাই করে। ওতে নরম হলে আমার চলে না। আজকাল তো তাই আর বরটর কাউকে বড় একটা দিতে চাই না। ও পাট তুলেই দিয়েছি। তোর জন্যই যে মনটা কেন নরম হয়ে পড়ল। যাবগে যাক, চেহারা তোর হবে'খন। একটু হাঁফ ছেড়ে নিই। হাতে একটু সময় পেলেই তোকে নতুন করে বানিয়ে দেবো'খন। আমার দুঃখটা কোথায় জানিস? আমারই আজ অবধি একখানা চেহারা হল না।

ঘুম থেকে উঠে রমেশ তড়াক করে লাফ মেরে বিছানা থেকে

নেমেই আয়নায় মুখ দেখল। না, ভগবান এখনও ফুরসৎ পাননি। সেই কালো হাড়গিলে চেহারা। সেই বিতিকিচ্ছিরি ছাঁটা গোঁফ।

আতাপুরে একটা বিয়েবাড়ির কাজ ছিল সেখান থেকে কুসুমপুরে যেতে হল যাত্রাপার্টির বড় প্যান্ডেল করতে। এলাহি ব্যাপার। তিন দিন ধরে তিনটে পালা হবে। সাত গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়বে। যাত্রাপার্টির কাজ থাকলে রমেশ খুশিই হয়। বিনি পয়সায় পালা দেখতে পায়।

কুসুমপুর খোদ ফটিকবাবুর গাঁ। বেশ বড়সড় জায়গা। নানা পয়সাওলা লোকের বাস। গোটা দশেক বাঁধানো পুকুর, তিনটে মন্দির, পাকা বাজার আছে। শিবরাত্রির মেলাটাও হয় জাঁকাল রকমের।

বিরাট প্যান্ডেল—তিন দিন ধরে দিনে রাতে কাজ করে বিস্তর মেহনতে যেটা খাড়া করা গেল। এই তিন দিন নাওয়া খাওয়া দম ফেলার ফুরসৎ অবধি রইল না রমেশের। দিনে রাতে যখন কাজ পায় তখনই নাকে মুখে দুটো গুঁজে দু-এক ঘণ্টা গড়িয়ে নিয়েছে। তিন দিনের দিন বেলা দশটা নাগাদ দুটো বাস বোঝাই হয়ে যাত্রাপার্টি চলে এল পালা করতে। কুসুমপুর ভেঙে পড়ল লোকে। প্যান্ডেলের চারপাশে মেলা বসে গেল।

যাত্রাপার্টির লোকেদের মহা খাতির। দত্তবাবুদের বাড়ির বাইরের মহলে তাদের জন্য বিরাট ব্যবস্থা। রমেশ সবই ঘুরে ঘুরে হাঁ করে দেখছে। যাত্রাপার্টির মেয়েরা যখন মুখে রংটং মেখে পার্ট করতে নামে তখন কেমন সুন্দর লাগে! এমনিতে রং ছাড়া সাদামাটা অবস্থায় তেমন সুবিধের নয়। কেউ কেউ তো রীতিমতো কুৎসিত। কিন্তু দেমাকে সব মটমট করছে।

গাঁয়ের মান্যগণ্যরা জড়ো হয়েছে ভারী বিগলিত মুখে। হেঁহেঁ করে যাচ্ছে। তার মধ্যে ফটিকবাবুকেও দেখতে পেল রমেশ। পাজামা আর আদ্দির পাঞ্জাবি পরা ফটিকবাবুই একমাত্র মেয়েদের কাছে খুব খাতির পাচ্ছে।

ভগবানের বরটা ফললে এ খাতির রমেশও পেত। রোদ্দুরে একটা কাঁঠাল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে বাতাসে মাংস রাঁধার ভুরভুরে গন্ধের ভিতর দাঁড়িয়ে রমেশ ভারী আনমনা হয়ে গেল।

যাত্রাদলের একটা লোক কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছিল। লক্ষ্য

করেনি রমেশ। হঠাৎ ছোকরা বলে ফেলল, কী দেখছো হে হাঁ করে ? এসব বাইরে থেকে দেখতেই ভাল। ভিতরে যাচ্ছেতাই। দু বছর হল আছি, সব মোহ কেটে গেছে।

রমেশ লোকটার দিকে চাইল। তার বয়সীই একটা ছোকরা। চেহারাটি বেশ কেষ্ট ঠাকুরের মতো। বড় ঝুলপি, রমেশ সসম্ভ্রমে বলল, আপনি এই দলে আছেন নাকি ?

আছি বটে। তবে এবার ভাবছি বাবার মোটর গ্যারেজের কাজেই গিয়ে লাগব। যা ভেবেছিলুম তা নয় মোটেই। তোমার মতো ছেলে ছোকরারা কেবল দলে ঢুকবার জন্য ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়। দুদিনেই মোহভঙ্গ হবে।

রমেশ বুঝল, ছোকরা কোনও কারণে চটে আছে কারও ওপর, বলল, হ্যাঁ তা তো বটেই।

তুমি কি এই গাঁয়ের লোক ? কী করো ?

আমি ডেকোরেটরের লোক। পাশেই অন্য গাঁয়ে থাকি।

আর যাই করো এ দলে ঢুকে পড়োনা যেন।

অমায়িক মুখে রমেশ বলে, আমাকে নেবেই বা কে ! যা চেহারা !

ছোকরা তার দিকে চেয়ে বলে, কেন, চেহারাখানা তোমার এমন কি খারাপ হে ? সবাই কার্তিক ঠাকুরটি হবে এমন তো কথা নেই। কার্তিক ঠাকুরদের আমি অনেক দেখেছি। ঘেন্না ধরিয়ে দিয়েছে। চলো, ওদিকটায় কোথাও বসি। চায়ের দোকান টোকান আছে এখানে ? সিগারেটও কিনতে হবে।

চলুন। বলে রমেশ নিয়ে গিয়ে ছোকরাকে পাঁচু মল্লিকের দোকানে বসাল।

ছোকরা চা খেতে খেতে বলল, এক কন্দর্পকে সকাল থেকে দেখছি। ফটিকবাবু। সারাক্ষণ মেয়েছেলেদের পিছু পিছু ঘুরছে। একটু আগে অচলা—ওই যে আমাদের সীতা আর সাবিত্রী সাজে—বলছিল, লোকটা বড্ড গায়ে-পড়া।

এ কথায় রমেশ একটু খুশি হয়ে বলে উঠল, বলেছে ?

বলবে না তো কি ? সকাল থেকে মেয়েটার পিছনে লেগে আছে। মেয়েটা না পারছে কাপড় ছাড়তে, না পারছে বাথরুমে যেতে। যেখানে যায় সেখানেই দেখে ফটিকচন্দ্রও হাজির। জানো, মেয়েটা অস্বস্তিতে আজ হাগেনি পর্যন্ত।

রমেশ হি হি করে হেসে ফেলল।

ভারী বেয়াদব লোক। চেহারা আছে তো সেটাকে মেয়ে পটানোর কাজে লাগাচ্ছে।

চায়ের দামটা রমেশই জোর করে দিয়ে দিল। ছোকরাকে তার বড্ড ভাল লেগে গেছে। ছোকরা যাওয়ার সময় বলল, অধিকারীর সঙ্গে আমার খুব ভাব। যাত্রাদলে ঢুকতে চাও তো আমাকে বোলো। আমার নাম মদন শিকদার।

ঘটনাটা ঘটল তিন দিন বাদে। যাত্রাপার্টি তল্পিতল্পা গুটোচ্ছে। প্যাণ্ডেল ভাঙাভাঙির কাজ শুরু হয়ে গেছে। রমেশ ভারী ব্যস্ত। আজই বিকেলে রামনগরে বড় কীর্তনের আসরের জন্য প্যাণ্ডেল শুরু করে দিতে হবে গিয়ে। দম ফেলার সময় নেই। তিন দিন প্রাণভরে যাত্রা দেখেছে রমেশ। দারুণ যাত্রা। মদন শিকদারের অভিনয়ও তার বড় ভাল লেগেছে। ছোকরা গায়ও ভাল। সুদামা হয়ে এমন গান গাইল যে আসর মাৎ। মদনের সঙ্গে আরও একটু ভাব হয়ে গেছে রমেশের। মদন বলেছে, তোমার গানের গলা আমার চেয়েও ভাল। অধিকারী শুনলে লুফে নেবে। চলো না, নিয়ে যাই।

রমেশ রাজী হয়নি। বলেছে, এ চেহারায় কিছু হয় না রে ভাই।

দূর বোকা। যাত্রার চেহারা আবার আসল চেহারা নাকি? দেখ না ওই শাঁকচুন্নির মতো দেখতে সবিতারানী যখন স্টেজে ওঠে তখন পরী। মেক আপই হল আসল জিনিস রে ভাই। গায়ের রংটা কোনও কথাই নয়।

রমেশ এখন একটু দোটানায় আছে। এই আনমনা ভাব নিয়েই সে বাঁশ ত্রিপল দড়িদড়া গোছাচ্ছিল। এমন সময় একটা মেয়ে আলুথালু হয়ে ছুটে এল ভাঙা প্যাণ্ডেলে। চেঁচিয়ে বলল, আমার দুল! আমার একটা ঝুমকো পেয়েছো তোমরা? আসরেই খসে পড়েছিল রাতে? এইমাত্র টের পেলুম।

মেয়েটা অচলা। ছিপছিপে, কম বয়সী শ্যামলা, মিষ্টি মেয়েটিকে বেশ লাগে রমেশের। মদন ট্যাপেটোপে জানিয়েছে এর সঙ্গে তার একটু আশনাই আছে। ব্যাপারটা পেকে ওঠেনি এখনও। তবে এর জন্যই দল ছেড়ে যেতে পারছে না মদন।

প্রায় বিশ হাত ওপরে কাঠের খুঁটির ডগায় বানরের মতো লটকে ছিল রমেশ। একটা গিঁট খুলছিল মন দিয়ে। চিৎকার শুনে

ধীরে ধীরে নেমে এল।

কী হয়েছে দিদি ?

উদভ্রান্ত মুখে মেয়েটা বলে, আমার একটা ঝুমকো পাচ্ছি না। সোনার ঝুমকো, আমার নিজের জিনিস।

রমেশ শান্ত গলায় বলে, পড়লে স্টেজেই পড়েছে। শতরঞ্জী তোলা হয়ে গেছে। আমি সেটা খুলিয়ে পেড়ে দেখছি।

মেয়েটা কাঁদো কাঁদো মুখে বলে, যদি কেউ নিয়ে গিয়ে থাকে ?

রমেশ বলল, সেটা ঠিক কথা। তবু খুঁজে দেখতে তো দোষ নেই।

বিশাল বিশাল দুটো শতরঞ্জী তোলা হয়ে গিয়েছিল। রমেশ সেগুলো খুলিয়ে ফের ঝেড়ে মুছে দেখল। নেই।

মেয়েটার দুচোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল, এমা! কী হবে বলুন তো ভাই। আমার তো বেশি সোনার জিনিস নেই। একটা দুল চলে গেল!

রমেশ আর কী বলবে, চুপ করে রইল। মনটা বড় তেতো! মেয়েটা চোখে আঁচল চেপে একটা চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে হঠাৎ মুখ তুলে ফোঁস করে উঠল, ওই শয়তানটা কাল লেবুতলায় জাপটে ধরেছিল হঠাৎ। তখনই কানে এমন লেগেছিল···

কে বলুন তো!

ওই ফটিক। মনে হয় তখনই হুকটা আলগা হয়ে গিয়েছিল। দিয়েছি একটা চড় কষিয়ে। কী অসভ্য পশু একটা!

রমেশের খুব হাসতে ইচ্ছে করল। কিন্তু মেয়েটার দুঃখ দেখে সেটা পেরে উঠল না। বলল, লেবুতলাটা দেখেছেন!

দেখিনি আবার! তন্ন তন্ন করে দেখেছি।

ঝুমকোর হদিশ পাওয়া গেল আরও কিছু পরে। যখন তুমুল গোলমালের খবর পাওয়া গেল ফটিকবাবুর বাড়িতে। রমেশ হাওয়ার আগে দৌড়োলো।

গিয়ে দেখল পাড়াপ্রতিবেশী মেলা জড়ো হয়ে গেছে উঠোনে বারান্দায়। ঘরের মধ্যে চেঁচামেচি চলছে মেয়েছেলের গলায়।

ভুঁড়ো গোঁফওয়ালা লুঙ্গিপরা একটা লোক কিচিক হাসি হেসে বলল, ফটিকের চাদরে কার যেন ঝুমকো দুল পাওয়া গেছে। একেবারে গেঁথে গিয়েছিল·· হেঃ হেঃ···

ফটিকবাবু, একটু বাদেই বারান্দায় বেরিয়ে এল। টেরি উবে গিয়ে

চুলগুলো সব আকাশমুখো উঠে আছে। গাল দুটো থাবড়া-খাওয়ার মতো লাল। চোখের নিচে কালিও পড়েছে নাকি? ফর্সা লোকটাকে এমন বেমানান দেখাচ্ছে। গায়ে একখানা গেঞ্জি, কে যেন বুকের কাছটা টেনে ছিঁড়েছে। লুঙ্গিটা উঠে আছে অনেকটা। মুখখানা এ মনভ্যাবলা যে মায়া হয়···

রমেশ আর দাঁড়াল না। যাত্রাপার্টি এখনও রওনা হয়নি। মদনকে দুলের খবরটা দিতে হবে। মেয়েটা বড় কাঁদছিল। আর আজ রাতে ভগবানকেও কিছু বলতে হবে। যা বলেছিল তার উল্টোটাই।

সুখরাম

সুখরামের জীবনে কোনও সুখ নেই। সুখরামের একটাই মাত্র নেশা, মাটি দিয়ে নানারকম মূর্তি গড়া। খেয়াল-খুশিমতো যা মনে আসে তাই সে চটপট গড়ে ফেলে। তার মূর্তিগুলো বেশ বিক্রিও হয়। আবার যা বিক্রি হয় না তাও অনেক জমে থাকে তার বাড়ীতে। মূর্তি গড়া ছাড়া সুখরামের আর কোনও কাজ নেই, নেশা নেই, ধান্ধা নেই।

সুখরামের আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবও বিশেষ কেউ নেই। তাতে অবশ্য সুখরামের কোনও অসুবিধেই হয় না। মূর্তি গড়তে গড়তে সে সেইসব মূর্তির সঙ্গেই আপনমনে কথা বলে। মূর্তিরা তো আর কথা কয় না, সুখরাম একাই একতরফা কথা বলে যায়। ওইভাবেই তার বুকের ভার লাঘব হয়।

তা বলে সুখরামের যে গুণগ্রাহী বা সঙ্গীসাথী নেই এমন নয়। পাড়া প্রতিবেশী বা শহরের লোকেদের মধ্যে কেউ কেউ আসে। অনেকে মূর্তি গড়া দেখতে, অনেকে আসে এমনিই। তা তাদের সঙ্গেও কথা বলতে হয় বটে সুখরামের, কিন্তু কথা বলে জুৎ পায় না সে।

ধনঞ্জয় এসে বলে, তুমি বাপু, কেমন যেন শুকনো মানুষ। রসকষ নেই হে তোমার ?

সুখরাম কথার পিঠে কথা কইতে জানে না। সে বলে, কথা টথা আমার আসে না।

সে তো বুঝলুম, কিন্তু নিজের গড়া পুতুলের সঙ্গে তো বাপু সারাদিন মুখের ফেকো তুলে বকবক করো। তা সেই কথাগুলোই না হয় আমাদের পুতুল ভেবে কইলে।

সুখরাম বলে, ওরা তো প্রশ্ন করে না, তাই কথা কইতে আটকায় না। অন্যেরা বড্ড কথা কয়। জিজ্ঞেস করে।

ধনঞ্জয় খুব হাসে। বলে, ওরে বোকা, কথা কয় বলেই তো

মানুষ। কথা কয়, হাসে, ঠাট্টা ইয়ার্কি করে, ঝগড়া কাজিয়াও করে, তবে না জ্যান্ত মানুষ। তোমার ওইসব মরা পুতুলের সঙ্গে কি জ্যান্ত মানুষের তুলনা হয়?

সুখরাম অবশ্য তফাৎটা তেমন বোঝে না। তবে ভাবে।

লামডিঙে যারাই বেড়াতে টেড়াতে আসত তারাই একবার করে সুখরাম কারিগরের পুতুল গড়ার আশ্চর্য কৌশল দেখে যায়। অনেকে বেশ চড়া দামে পুতুল কিনেও নেয়। সুখরামের আশ্চর্য সব পুতুলের মধ্যে মানুষ আছে, জন্তু জানোয়ার আছে, পাখি কীটপতঙ্গও আছে। সুখরাম যা দেখে তাই গড়ে ফেলতে পারে। এটাই তার আশ্চর্য ক্ষমতা।

লামডিঙ এক আশ্চর্য জায়গা, সবাই জানে। এখানেই একমাত্র খাঁটি ধানীরঙের রোদ দেখা যায় সকালে। এখানকার জ্যোৎস্না এক বিখ্যাত জিনিস। এরকম সবুজ জ্যোৎস্না পৃথিবীর কোথাও ফোটে না। আর প্রতি রাতেই জ্যোৎস্না লামডিঙ ছাড়া আর কোথায় দেখতে পাবে মানুষ? লামডিঙের ঘাসে লেবুপাতার মৃদু গন্ধ আছে। গাছপালার রঙ এমন উজ্জ্বল সবুজ যে, মনে হয় কোন পটুয়া সদ্য রং লাগিয়ে গেছে। গাছে এত ফুল ফোটে যে, ফুলের মধু খেয়ে খেয়ে মৌমাছি আর মধুভুক পতঙ্গদের দিনরাত মাতাল অবস্থা। ফুলের গন্ধে বাতাস সর্বদা ভারী হয়ে থাকে। আর ফল? মানুষের তো ফল খেয়ে খেয়ে অরুচি হয়েছেই, পাখি পক্ষীরা অবধি ফল খেয়ে খেয়ে হেঁদিয়ে পড়ে থাকে। আর ঋতুর কথা উঠলে বলতেই হবে যে, লামডিঙে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বলে কিছু নেই। এখানে যেন সর্বদাই শরতের একটা ভেজা ভেজা অথচ উজ্জ্বল ভাব। দরকার মতো বৃষ্টি হয়, কিন্তু মেঘলা হয়ে থাকে না।

তা এই লামডিঙে ঘুরে ঘুরে সুখরাম যা দেখে তাই গড়ে ফেলতে দেরী করে না।

তা সুখরাম একদিন লামডিঙের এক কুঞ্জবনে কয়েকজন মেয়েকে চড়ুইভাতি করতে দেখতে পেল। এরা সব বাইরে থেকে আসা মানুষ। লামডিঙের সবাইকে সুখরাম চেনে। এরা তার অচেনা। মেয়েরা নদী থেকে জল আনছিল, কাঠকুটো জ্বেলে ভাত রান্না করছিল, আর হৈ হৈ করে খুব হাসছিল। তাদের মধ্যে একটা মেয়েকে দেখে সুখরাম একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। এমন সুন্দর মেয়ে সে কখনও

দেখেনি। সবুজ রঙের একখানা শাড়ি পরা মেয়েটা যেন স্বর্গরাজ্য থেকে নেমে এসেছে। মুখখানা নিখুঁত।

সুখরাম সরল মানুষ। তার ভারী ইচ্ছে হল মেয়েটার সঙ্গে গিয়ে একটু কথা কয়। কিন্তু কথা কইতে সে মোটে জানেই না। তার ওপর কারিগর মানুষ, তার পোশাক টোশাক মোটেই ভাল নয়। তার হাতে পায়ে মুখে সর্বদা মাটি লেগে থাকে। কস্মিনকালে দাড়ি কামায় না সুখরাম। চুলও আঁচড়ায় না। জামা-কাপড়ও নোংরা। তাকে দেখে কারও বিশ্বাসই হবে না যে, সে এত বড় একজন শিল্পী-মানুষ।

সুখরাম মুগ্ধ হয়ে মেয়েটাকে দেখতে দেখতে সম্মোহিতের মতো উঠে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। তাকে দেখে সব মেয়েই কাজকর্ম থামিয়ে হাঁ করে চেয়ে থাকে। সুখরামকে তারা তো চেনে না। ভাবে, পাগল-টাগল বুঝি। সুখরাম তোতলাতে তোতলাতে বলে, তোমার নামটি কি?

মেয়েটা একটু গম্ভীর আর কঠিন হয়ে বলে, তা দিয়ে আপনার কী দরকার?

সুখরাম এরপর এত তোতলা হয়ে গেল যে আর কোনও কথাই তার মুখ দিয়ে বেরোলো না। তার সেই সঙ্গীন অবস্থা দেখে মেয়েগুলোর সে কী হাসি!

সুখরাম লজ্জায় অপমানে লাল হয়ে পালানোর পথ পায় না।

পালিয়ে এলেও সে মেয়েটাকে কিছুতেই আর ভুলতে পারে না। চোখ বুজলে দেখতে পায়, চোখ খুললেও দেখতে পায়। তার দুটি হাত আপনা থেকেই এঁটেল মাটি মাখতে লাগল। তার দুটি নিপুণ হাতে ধীরে ধীরে মাটির প্রতিমা হয়ে মেয়েটি ফুটে উঠল। যতদূর পারে নিখুঁত করেই গড়ল তাকে সুখরাম। খুব যত্ন করে, খুব ভালবাসা দিয়ে। একদিন যখন সত্যিই শেষ হল সেই মূর্তি, সেদিন সুখরাম নিজের সৃষ্টি দেখে নিজেই অবাক। সে এতকাল ধরে মূর্তি গড়ছে, কিন্তু এতটা জীবন্ত যেন আর কোনওটাই নয়। মেয়েটি যেন চোখের পাতা ফেলবে এক্ষুনি। এখনই যেন হেসে উঠবে। বা কথা কইবে।

ধনঞ্জয় এসে মূর্তিটা খুব ভাল করে নিরিখ করার পর বলল, বাঃ, খাসা হয়েছে তো! তোমার বাহাদুরি আছে বটে। এ মূর্তি ভাল দামে বিকোবে হে।

ওটা বেচব না।

সুখরাম মূর্তিটার সঙ্গে যথারীতি কথা কয়। ভালবাসার কথা, সুখের কথা, দুঃখের কথা, আবার মানে নেই এমন কথাও।

দিন যায়। রাত যায়। লোকে আসে, সুখরামের মূর্তি দেখে ভীড় করে ফেলে, সাধুবাদ দেয়। সুখরাম গা করে না। কারও দিকে ফিরেও চায় না। সেই মেয়েটার মূর্তি সুখরাম একটু সরিয়ে একটা পর্দার আড়ালে রেখেছে, যাতে পাঁচ জনের নজর না পড়ে।

কিন্তু নজর পড়ল ঠিকই। সুখরামের ওই মূর্তির কথা ধনঞ্জয় জানে, আরও কয়েকজন খবর রাখে। তারাই বলে বেড়ায়, ওফ, সে যা একখানা মূর্তি তার কাছে কিছুই লাগে না। এইভাবে কথাটা পাঁচকান হল। লোকে আসে, সেই মূর্তিটার খোঁজ খবর নেই। অনেকে দেদার টাকাও দিতে চায়। সুখরাম অবশ্য রাজি হয় না।

একদিন সুখরাম দুপুরবেলা আপনমনে একটা রোগা ছাগলের মূর্তি তৈরি করছে। হুঁশ নেই। হঠাৎ তার নজর পড়ল তার সামনে দু'খানা সুন্দর পা। মেয়ের পা। সে চোখ তুলল। তার সামনে মূর্তিটা দাঁড়িয়ে। সুখরাম হাঁ হয়ে চেয়ে দেখল, মূর্তির চোখের পলক পড়ল। মূর্তি একটু হাসলও। তারপর মূর্তি বলল, তোমার জন্য পুতুল থেকে প্রাণ পেয়ে জ্যান্ত হয়ে আসতে হল।

সুখরাম তোতলাতে লাগল, কথা বেরোলো না মুখ দিয়ে।

মূর্তি বলল, আমার একটা নাম দেবে না? কী নাম হবে আমার বলো তো!

সুখরামের কথা এমন বেধে গেল যে, সে লাল হয়ে উঠল, বিষম খেল। কাশতে লাগল।

দু'খানা পেলব হাতে তাকে ধরে তুলল মূর্তি। বলল, আমার নাম দাও মনোরমা, নামটা আমার খুব পছন্দ।

সুখরাম ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

মূর্তি বলল, আমি তোমার কাছে কি হিসেবে থাকব বলো তো? একটা তো সম্পর্ক চাই, নাকি?

আড়াল থেকে ধনঞ্জয় বলল, ও বাবা, এ যে সাংঘাতিক কাণ্ড, যাই গিয়ে পুরুতমশাইকে ডেকে আনি।

তারপর সুখরামকে দাড়ি কাটতে হল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে হল, ভাল জামাকাপড় পরতে হল। দেখা গেল, সুখরাম আসলে অতি

সুপুরুষ এক যুবক। মনোরমা কনের সাজে যখন বিয়ের পিঁড়িতে বসে তার চোখে চোখ রাখল তখন সুখরামের রূপ দেখে তারও চোখের পলক পড়ে না।

রাত্রিবেলা মনোরমা এক ফাঁকে তার কানে কানে বলল, সেদিন ওরকম পাগলে পাগলে চেহারায় দেখেছিলুম বলে তোমার সঙ্গে কথা কইনি। তুমি যে এত সুন্দর তা জানলে কি আর অবহেলা করতুম?

সুখরাম অবাক হয়ে বলে, কোনদিন বলো তো?

মনোরমা অবাক হয়ে বলে, কেন, আমাদের সেই চড়ুইভাতির দিন!

সুখরাম চমকে উঠে বলে, তুমি তাহলে আমার সেই মূর্তি নও?

মনোরমা হেসে ফেলে, মূর্তি হতে যাবো কোন দুঃখে, ঠাট্টাও বোঝো না? তোমার মূর্তি যেমনকে তেমন আছে।

সুখরাম গিয়ে দেখল, বাস্তবিকই তাই। সেই মূর্তি যেমন ছিল তেমনই রয়েছে।

মনোরমা পরে তাকে বলল, চড়ুইভাতির দিন থেকেই কেন যেন মনটা খারাপ। বাড়ি ফিরে গিয়ে শান্তি পেলুম না। বারবার মনে হচ্ছিল পাগলটাকে নিয়ে ওরকম হাসাহাসি উচিত হয়নি। তারপর একদিন তোমার নাম শুনে তোমার গড়া মূর্তি দেখতে এলুম। তুমিই যে সুখরাম কি করে জানবো বলো! তোমাকে দেখলুম, তোমার গড়া আমার মূর্তি দেখলুম। তারপর ঠিক করলুম, আমাকে যে এত ভালবাসে তাকে ছেড়ে আমি থাকব কি করে?

সুখরাম বলল, তুমি আমাকে খুব ভালবাসো?

খুব। আমার চেয়ে কেউ তোমাকে বেশি ভালবাসে না।

হঠাৎ ঘরের বাইরে থেকে তৃতীয় একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠল, মিথ্যে কথা। ওকে আমিই সবচেয়ে ভালবাসি।

মনোরমা চমকে উঠে বলে, মেয়েটা কে গো? সুখরাম গিয়ে দরজা খুলে অবাক। মনোরমা। ঘরের মধ্যেও মনোরমা দরজার বাইরেও মনোরমা। এ কী কাণ্ড!

বাইরের মনোরমা ঘরে এসে ঘরের মনোরমার দিকে চেয়ে বলল, খুব যে সোহাগ দেখাচ্ছো, এতদিন কোথায় ছিলে বাপু? ও যে তিল তিল করে আমাকে গড়ল এত ভালবাসা দিয়ে, যত্ন দিয়ে, কত গোপন কথা বলল আমার কানে কানে সে সব কি মিথ্যে হয়ে যাবে?

মনোরমা আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠে বলল, কে তুমি?

আমি ওর মনোরমার সেই মূর্তি। তোমাদের আদিখ্যেতা দেখে আর থাকতে পারলুম না। এরপর যা হল তা সাংঘাতিক কাণ্ড। দুই মনোরমার প্রচণ্ড ঝগড়া। এ ওকে স্বীকার করতে চায় না, ও একে মানুষ বলেই গণ্য করতে নারাজ।

সুখরাম ভারী বিপাকে পড়ে গেল। সে কোনও মনোরমাকেই অস্বীকার করতে পারে না। সেই থেকে সুখরামের সুখ বলতে আর কিছু নেই। বাড়িতে দু দুটো মনোরমা দিনরাত খেয়োখেয়ি, ঝগড়া করে। সুখরামের আবার দাড়ি গজাল, জামাকাপড় নোংরা হল, হাতে পায়ে সবসময়ে মাটির দাগ। সে পুতুল গড়ে আর পুতুলদের সঙ্গে কথা কয়।

বুড়ো একটা মূর্তি হঠাৎ বলে উঠল, নাঃ আর তো সহ্য হয় না।

সুখরাম খুব অবাক হয়ে বলে, কী সহ্য হয় না ?

বুড়োটা খ্যাঁক করে উঠে বলে, তোমার বাড়িটায় আগে বেশ শান্তি ছিল। কেন যে বিয়ে করতে গেলে সেটাই বুঝলুম না। না হে, এখানে আর পোষাচ্ছে না। যাই গিয়ে অন্য জায়গায় ব্যবস্থা দেখি।

সুখরামের চোখের সামনে দিয়ে বুড়োটা হেঁটে চলে যেতেই একটা যুবতী মেয়ে পিছন থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল, তোমাকেও বলিহারি যাই বাপু। কবে থেকে হা-পিত্যেশ করে তোমার জন্য বসে আছি, আর তুমি হঠাৎ আমাকে ছেড়ে আর একজনের সঙ্গে আশনাই শুরু করে দিলে! কেন, আমি কি ফেলনা? একসময়ে তো আমার সঙ্গেও অনেক ভাব ভালবাসার কথা বলেছো!

কোণ থেকে একটি কিশোরীর মৃণ্ময় মূর্তি একটা লাফ মেরে বেদী থেকে নেমে এসে মুখ ভেঙিয়ে বলল, ইঃ রে, সুখরাম গেছে তোমার মতো গেছো মেয়ের সঙ্গে ভাব করতে! তোমাকে চিনিনা নাকি বিদিশা? এই তো ক'দিন ধরে দেখছি ওই বলরামের সঙ্গে গুজগুজ ফুসফুস করতে। তোমার মতো নষ্ট চরিত্র দুটি আছে? সুখরামের সঙ্গে যদি সত্যিকারের কারও ভালবাসা থেকে থাকে তবে সে হল আমি।

বলরাম নামের মূর্তিটাও বিরক্ত হয়ে বলে, বাস্তবিকই বিদিশা, তুমি কিন্তু আমার সঙ্গে বিরাট বিশ্বাসঘাতকতা করছো।

এই গণ্ডগোলে আরও কয়েকটা মূর্তি এগিয়ে এল। বেশ চেঁচামেচি এবং হৈ চৈ হতে লাগল। চুলোচুলি, কিল চড়ও চলতে

শুরু করল। সুখরাম একটা ন্যাড়ামাথাওয়ালা দৈত্যের মূর্তি তৈরি করেছিল অনেকদিন আগে। হাতে প্রকাণ্ড মুগুর। এতক্ষণ সেটা চুপচাপ ছিল। হঠাৎ প্রাণ পেয়ে জেগে উঠে সে মুগুর নাচিয়ে হুঙ্কার দিল, ওরে বোকারা তোরা ঝগড়া করে মরছিস কেন? এইসব গণ্ডগোলের মূলে হল ওই সুখরাম। চল সবাই মিলে ওটাকে ধরে ঠ্যাঙাই।

এই বলে দৈত্যটা মুগুর তুলে তেড়ে এল। সঙ্গে অন্য সবাই।

সুখরাম হঠাৎ বিপদের গন্ধ পেয়ে চোঁ চোঁ দৌড়তে লাগল।

লামডিঙ জায়গাটা সুখরাম বিলক্ষণ চেনে। সে নানা পথে, নানা কায়দায় পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগল।

কিন্তু মুশকিল হল, পুতুলেরা সংখ্যায় অনেক। তারা নানা পথে তাকে ধাওয়া করতে থাকে। বিভিন্ন পথের মোড় তারা আটকাতে লাগল, যাতে সুখরাম পালাতে না পারে।

পালাতে পালাতে এসে সুখরাম বুঝতে পারল, আর পালানোর পথ নেই। সামনেই সেই কুঞ্জবন, যেখানে সে বসে থাকতে ভালবাসে। সে কুঞ্জবনে ঢুকে পড়ল।

সামনেই একটা বেদী। বোধহয় সুখরামেরই কোনও মূর্তিকে এখানে বসানোর জন্য পুরপিতারা বেদীটা তৈরি করিয়েছেন। সুখরামের মাথায় চড়াক করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে এক লাফে বেদীর ওপর উঠে সটান মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে গেল।

ওদিকে সুখরামকে খুঁজতে তার মূর্তিরাও সেই কুঞ্জবনে এসে হাজির। তাদের মধ্যে এই মনোরমাও আছে।

সুখরামকে বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সবাই চেঁচিয়ে উঠল, ওই তো সুখরাম, চলো ওকে ধরে জিজ্ঞেস করি কোন আক্কেলে ও আমাদের বানাতে গিয়েছিল।

দৈত্য সবার আগে এসে সুখরামের সামনে দাঁড়াল। তার পেটে একটা খোঁচা দিয়ে দৈত্য বলল, কি হে সুখরাম, কেমন বুঝছো? এবার পালাবে কোথায়?

সুখরাম জবাব দিল না।

সবাই চেঁচাল, ও ভান করছে! ওকে টেনে নামাও।

দৈত্য হঠাৎ ঝুঁকে সুখরামের চোখ নাক মুখ শরীর সব পরীক্ষা করে মাথা নেড়ে বলে, না হে, ভান করছে না।

তার মানে ?

দৈত্য একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, সুখরাম সত্যিই মূর্তি হয়ে গেছে। প্রাণ নেই।

একথা শুনে চারদিকে একটা কোলাহল উঠল। তবে কোলাহলটা আস্তে আস্তে থেমেও গেল। কারণ সবাই একে একে পরীক্ষা করে দেখল, বাস্তবিকই সুখরাম আর সুখরাম নেই। সে মূর্তি হয়ে গেছে।

সুখরামের গড়া পুতুলেরা সবাই বিজয়-উল্লাসে চারদিক ছড়িয়ে পড়ল। তারা আর পুতুল নেই, সবাই আসল মানুষ এবং জীবজন্তুতে রূপান্তরিত হয়েছে। আশ্চর্য জায়গা লামডিঙে তারা মহা সুখে বসবাস করবে। দুই মনোরমাও দিব্যি তাদের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে আনন্দ করতে লাগল।

বেচারা সুখরাম নট নড়ন নট চড়ন দাঁড়িয়ে রইল বেদীর ওপর।

পরদিন লামডিঙ ভেঙে পড়ল সুখরামের মূর্তি দেখতে। সবাই একবাক্যে বলল, হ্যাঁ, সুখরাম নিজের যে মূর্তিখানা বানিয়েছে সেখানাও তার সারা জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ। এরকম মূর্তি দুনিয়ায় কেউ কখনও দেখেনি। কিন্তু কবে বানাল, কবে এসে চুপি চুপি মূর্তিখানা এখানে রেখে গেল তা কেউ বলতে পারল না। সুখরামের হাঁটুতে একটা মশা এসে বসল, মাথায় একটা কাক। সুখরাম তাদের তাড়ানোর জন্য হাতখানাও তুলতে পারল না। প্রস্তরীভূত সুখরাম মনে মনে শুধু বলল, শ্রেষ্ঠ কাজ না কচু !

পরী

জয়মঙ্গলের মনটা আজ ভাল ছিল না। মন ভাল না থাকার যথেষ্ট কারণও আছে। তার বাপ বিল্বমঙ্গল লোহার কারবারি। বিরাট ব্যবসা। জয়মঙ্গল তার একটিমাত্র সন্তান। বিল্ব চায় জয়মঙ্গল এখন লায়েক হয়েছে, অন্য দিকে মাথা না খেলিয়ে বাপের ব্যবসায় মন দিক। লাখো লাখো টাকার কারবার জলে না যায়। জয়মঙ্গলের ইচ্ছে তা নয়। সে ছবি আঁকতে চায়, কবিতা লেখে, উড়ু উড়ু মন নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তার স্বভাব ভাবুক প্রকৃতির, বাপ-ব্যাটার এ নিয়ে অশান্তি আছে। জয়মঙ্গলের মা এতকাল ছেলের পক্ষেই ছিল, বাপের বকাঝকা এবং শাসন থেকে তাকে আগলে রাখত কিন্তু ইদানীং মাও বিগড়েছে। মা এখন চাইছে জয়মঙ্গল এইবার ব্যবসার দিকে মন দিক। এখন জয়মঙ্গলের মনে শান্তি নেই। ব্যবসা তার ভাল লাগে না শুধু টাকা রোজগার করে যাওয়ার মধ্যে সে মজা পায় না, হিসেবনিকেশ তার মাথায় আসে না।

এরকম অবস্থায় জয়মঙ্গলের মন সংসারের দিকে ফেরাতে এবং বিষয়মুখী করতে তার মা আর বাবা আর একটা চাল চেলেছে। সেটা হলো, বিয়ে। মহেশ পোদ্দার আর একজন বিরাট ব্যবসাদার। তার কাপড়ের ব্যবসাতেও লাখো লাখো টাকা খাটে। মহেশের সাত মেয়ের মধ্যে সবচেয়ে ছোটোটি এখন বিয়ের বাকি। তার সঙ্গেই জয়মঙ্গলের বিয়ের কথা একরকম পাকা। জয়মঙ্গল পাত্রীকে দেখেনি, দেখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও নেই। বিয়ের কথা শোনা ইস্তক তার মাথায় আগুন জ্বলছে। মাত্র তেইশ বছর বয়সে সংসারের জোয়ালে জুতে গেলে জয়মঙ্গলের জীবনটা যে মরুভূমি হয়ে যাবে তা সে ভালই জানে। মহেশকে সে বার কয়েক দেখেছে, কালো, মোটা, বিচ্ছিরি দেখতে। চোখ দুটো কেমন যেন গোল গোল। সবসময় মুখে কেবল বিষয়-আশয় আর টাকাপয়সার কথা। এর মেয়েকে বিয়ে করলে জীবনটা একেবারে নষ্ট।

বিয়েটা ঠেকানোর জন্য যতরকম চেষ্টা তার পক্ষে সম্ভব সবই জয়মঙ্গল করে দেখেছে। কোনও লাভ হয়নি। মা-বাবা দু'জনেরই অভিমত, বিয়ে করলে জয়মঙ্গলের সংসারে মন বসবে, উড়ু উড়ু ভাবটাও বিদায় নেবে। তার ওপর বংশরক্ষার প্রশ্নও আছে।

আত্মহত্যা করবে না নিরুদ্দেশ হবে তাই নিয়ে দিনকতক ভেবে দেখল জয়মঙ্গল। আত্মহত্যা করতে একটু ভয় করে তার। মরার কষ্ট তো আছেই, তার ওপর মা-বাবাকে বড্ড দাগা দেওয়া হবে। নিরুদ্দেশ হওয়ারও হ্যাপা কম নয়। কোথায় খাবে, কোথায় শোবে, কোন গাড্ডায় গিয়ে পড়বে তার ঠিক কি ?

আজ তার মাথাটা বড্ডই গরম, আজ তার আশীর্বাদ। মহেশ আর তার আত্মীয়কুটুমরা দল বেঁধে আশীর্বাদ করতে আসছে বিকেলে। আশীর্বাদ উপলক্ষে এ-বাড়িতেও আজ মেলা আত্মীয়কুটুম এসেছে। বিস্তর বাচ্চা-কাচ্চা বুড়ো-মদ্দা বউ-ঝি। সবাইকে চেনেও না জয়মঙ্গল। তার শুধু মাথাটা গরম থেকে আরও গরম হয়ে যাচ্ছে। ফাঁদে পড়লে বন্য জন্তুদের বোধহয় এরকমই অবস্থা হয়। পালানোর পথ নেই, উদ্ধার পাওয়ার উপায়ও কিছু মাথায় আসছে না। শরীর মন খুবই অস্থির। আজ তাকে তেতলার ঘরে প্রায় বন্দী করে রেখেছে মা। সে ঘন ঘন জল খাচ্ছে, বই পড়ার চেষ্টা করে মন দিতে পারছে না, আকাশের দিকে চেয়ে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। তেতলায় ঘরের লাগোয়া বিশাল ছাদ। চারদিকে ফুলের টবে নানারকম ফুল ফুটেছে। কিন্তু ফুলের সৌন্দর্য মোটেই আকর্ষণ করছে না আজ তাকে। কিছুই আকর্ষণ করছে না। বুকজোড়া ভয়, মাথাভরা দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ।

জয়মঙ্গলের মা আর বাবা দু'জনেই খুব ভক্তিমতি আর ভক্তিমান। বাড়িতে গৃহদেবতার নিত্যপুজো হয়। সাধু-সজ্জনদের আনাগোনা আছে বাড়িতে। তার বাবার দান-ধ্যানও আছে। জয়মঙ্গলের কিন্তু ভগবানে মতি নেই। কিন্তু আজ বিপদে পড়ে সে আকাশের দিকে চেয়ে বার কয়েক ভগবানকেও ডাকল—ভগবান, যদি তুমি সত্যিই থেকে থাকো তাহলে এই বিপদ থেকে বাঁচাও। ভগবান অবশ্য তেমন গরজ করলেন না। জয়মঙ্গলও বেশিক্ষণ ডাকাডাকি করতে পারল না।

খোলা ছাদের একধারে জলের বড় ট্যাঙ্ক আছে। জ্যোৎস্না রাতে জয়মঙ্গল মাঝে মাঝে ছাদে উঠে জলের ট্যাঙ্কে সওয়ার হয়ে চাঁদ দেখে

আর আবোল-তাবোল ভাবে। এটা অবশ্য জ্যোৎস্না রাত নয়, সকাল। আর মনটাও ভাল নেই। তবু জয়মঙ্গল জলের ট্যাঙ্কের ওপর উঠে বসল।

আর বসতেই অনেকটা দূরে মহেশের প্রকাণ্ড বাড়িটার মস্ত চূড়া দেখতে পেয়ে মনটা বিস্বাদ হয়ে গেল। দক্ষিণ দিকে প্রায় সিকি মাইল দূরে মহেশের বিরাট বাড়ি। জয়মঙ্গল শুনেছে, বাড়িটার ভিতরে তিনটে মহল আছে। বিরাট এলাকা। অনেক দাসদাসী আছে, গোটা চারেক কুকুর আছে, গোঁফওয়ালা দারোয়ান আছে।

অনেক দূর থেকে মহেশের বাড়ির চূড়ায় ঘড়িটা দেখতে পেল জয়মঙ্গল। ঘড়ির ওপব একটা পাথরের পরীও আছে। লোকটার টাকা আছে, কিন্তু শিক্ষা বা রুচি নেই। এই লোকের মেয়েকে বিয়ে করা আর ফাঁসিতে যাওয়া একই ব্যাপার।

খুব বিষ-চক্ষুতে মহেশের বাড়ির দিকে চেয়ে রইল জয়মঙ্গল। মা-বাবা যে কেন তার সঙ্গে এমন শত্রুতা করল তা ভেবে চোখে জল আসছিল তার। জয়মঙ্গলের মনের দিকে কেন তারা চেয়ে দেখল না? কেন জোর করে তাকে বিয়ের ফাঁস পরাতে চায় তারা? কেনই বা বিল্বমঙ্গলের ব্যবসার সঙ্গে তাকে জুড়ে দিতে চায় তারা? জয়মঙ্গল যে ও জগতের মানুষই নয়।

জয়মঙ্গল একদৃষ্টে চেয়ে ছিল মহেশের বাড়ির দিকে। হঠাৎ তার মনে হলো, চোখে সে ভুল দেখছে বোধহয়। মহেশের বাড়ির চূড়ার শ্বেতপাথরের পরীটা কি হঠাৎ একটু নড়ে উঠল?

ও বাবা! তাই তো! শুধু নড়া নয়, হঠাৎ যেন দুটি ডানা মেলে দিয়ে পরীটা ধীরে ধীরে আকাশেও উঠে যাচ্ছে! নিজের মাথাটা বারকয়েক ঝাঁকাল জয়মঙ্গল, চোখ কচলে নিয়ে ফিরে তাকাল। নীল আকাশে শ্বেতশুভ্র পরীটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন। অনেকটা কাছে এসে গেছে যে!

উত্তেজনায় আতঙ্কে জয়মঙ্গলের বুকটা ধক করে উঠল। এসব কী দেখছে সে? দুশ্চিন্তায় আর উদ্বেগে তার মাথার গোলমাল হয়নি তো!

পরীটা কিন্তু একরোখা গতিতে নীল আকাশে দুটি সাদা ডানা মেলে সোজা তাদের ছাদের দিকেই উড়ে আসছে। জয়মঙ্গল ট্যাঙ্কের ওপর উঠে দাঁড়াল। তার হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। সে ট্যাঙ্কের

ওপর থেকে ছাদে নামতে গেল। কিন্তু হিসেবের এমন গণ্ডগোল যে ছাদের বদলে সে লাফ দিল শূন্যে। তিনতলা থেকে সোজা পঁচিশ-ছাব্বিশ ফুট তলায় গিয়ে পড়লে কী হবে তা মুহূর্তের মধ্যে তার মাথায় বিদ্যুতের মতো খেলে গেল বটে, কিন্তু কিছুই করার ছিল না তখন। অবধারিত মৃত্যুর দিকে তীব্র গতিতে নেমে যেতে লাগল সে। শুধু একবার বলে উঠল, মাগো !

আশ্চর্য ! পড়তে পড়তেও পড়ল না সে। তার শরীরকে ক্যাচ লোফার মতো কে যেন ধরে ফেলল। অবাক হয়ে সে দেখল, তার শরীরটা ধরে আছে সাদা রঙের সেই পরী। সে পরীর পিঠের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

জয়মঙ্গল আর একবার আতঙ্কে চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু দেখল, পরীটা তাকে নিয়ে চোখের পলকে ছাদ ছাড়িয়ে অনেক ওপরে উঠে পড়েছে।

এ কী ! এসব কী হচ্ছে ? বলে জয়মঙ্গল চেঁচিয়ে উঠল।

পরীটা পায়ের তলা থেকে খুব ধীরে তার মুখটা ফিরিয়ে জয়মঙ্গলের মুখের দিকে চেয়ে মিষ্টি করে একটু হাসল। মেয়েপরীটার মুখ ভারী সুন্দর। আর আশ্চর্যের বিষয়, এখন পরীটার সেই পাথুরে ভাবটাও আর নেই। সাদা রংটাও নয়। নরম একটি মেয়ে-শরীর যেন তাকে শূন্যে ধরে রয়েছে। পরীটার গায়ের রংটাও এখন দেখাচ্ছে মাজা জেল্লাদার। তার চেয়েও বিস্ময়ের কথা, পরীটা কখন চমৎকার একটা আকাশী রঙের শাড়ি পরে নিয়েছে, চুল বেঁধেছে এলো খোঁপায়।

এসব কী হচ্ছে ? কী হচ্ছে এসব ?

পরী খুব মিহিন গলায় বলল, যা চেয়েছিলে তাই হচ্ছে। আমি হচ্ছি ইচ্ছে ঠাকরুণ। মাঝে মধ্যে মানুষের ইচ্ছে মিটিয়ে দিই।

কোথায় নিয়ে চলেছো আমাকে ?

একটু নিরিবিলিতে, কথা কইবো।

আমার ভয় করছে।

ভয় পেও না, তোমাকে নির্ঘাৎ মরণের হাত থেকে বাঁচালুম, সে কি ভয় দেখানোর জন্য ?

মরছিলুম তো তোমার জন্যই। পাথরের পরী কী কখনও ওড়ে ?

বাইরে থেকে যত পাথর ভাবো তত পাথর তো নই। কেন যে

পাথর বলে এত হেলাফেলা করো ?

নিজের চারদিকে চেয়ে জয়মঙ্গলের বুক শুকিয়ে গেল। সে প্রায় মেঘের রাজ্যে চলে এসেছে। এত ওপরে যে, তলাটা প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। ওপরে নীল আকাশ আর উজ্জ্বল রোদ, হু হু করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে।

জয়মঙ্গল বলে উঠল, শোনো, তুমি পরী হলেও মেয়েমানুষ, তোমার পিঠে সওয়ার হতে আমার লজ্জা করছে, আমাকে নামিয়ে দাও।

পরী রিনরিন শব্দে হেসে উঠে বলে, মেয়েরা তো চিরকালই পুরুষের বোঝা বয়। নতুন কিছু তো নয়। আর তুমি! তুমি তো এখনও অপোগণ্ড। তোমার বোঝা বয় তোমার বাবা, তোমার মা। আজ অবধি তো তুমি নিজের জামাটাও ইস্তিরি করতে পারো না।

তোমাকে ওসব কথা কে বলল ?

ওই দূর থেকে আমি তোমার ওপর লক্ষ্য রাখি যে।

কেন রাখো ?

লক্ষ্য রাখাই যে আমার স্বভাব। কোথায় কী হচ্ছে সব আমার নখদর্পণে।

তুমি কি জানো যে আজ আমার আশীর্বাদ ?

জানবো না কেন ?

জানো যে এর চেয়ে ফাঁসি হওয়াও ভাল ? আমাকে না বাঁচালেই তুমি ভাল করতে। তিনতলার ছাদ থেকে পড়ে শেষ হয়ে গেলেই শান্তি হতো।

পরী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তাই বুঝি ? তুমি মরলে যে আরও কারও কারও দীর্ঘশ্বাস শুরু হতো ?

হ্যাঁ, তা জানি। আমার মা আর বাবার। কিন্তু তারাই তো আমার সর্বনাশের জন্য দায়ী !

পরী আকাশের এক কোণে একটা ছোট্ট গোলাপী মেঘের টুকরো খুঁজে পেয়ে তার ওপর ধীরে নামল। পিঠ থেকে জয়মঙ্গলও নামল। পরী ডানা গুটিয়ে মুখোমুখি বসে বলল, জায়গাটা কেমন লাগছে ?

মেঘটা খুব ছোটো। বড়জোর একটি মাদুরের মতো। বেশ নরম আর মোলায়েম। বসে জয়মঙ্গল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এই মেঘের রাজ্যেই কি থাকা যাবে ?

থাকতে চাও ?

চাই। মহেশ পোদ্দারের মেয়ের হাত থেকে বাঁচতে সবকিছু করতে পারি। পরী, আমাকে এই মেঘটা দেবে?

পরী এত সুন্দর করে হাসল যে, মাথা ঘুরে গেল জয়মঙ্গলের। সে হাঁ করে চেয়ে রইল। পরী চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, অত ভাবছো কেন? যখন ইচ্ছে করবে তখনই আমি তোমাকে মেঘের রাজ্যে উড়িয়ে নিয়ে আসব। কোনও চিন্তা নেই।

সত্যি বলছো?

সত্যি না হলে মেঘের ওপর বসে আছো কি করে?

বিশ্বাস হচ্ছে না। আচ্ছা, আমাদের বাড়িতে এখন কী হচ্ছে?

কি আবার! তোমাকে খুঁজে না পেয়ে তোমার মা অজ্ঞান হয়ে গেছেন। তোমার বাবা গেছেন পুলিশে খবর দিতে।

ও বাবা! আমার যে ভয় করছে!

ভয় কি! তুমি তো সকলের নাগালের বাইরে মেঘের ওপর বসে আছো!

জয়মঙ্গল হঠাৎ ধরা গলায় বলল, ইস, মহেশের মেয়ে না হয়ে যদি তুমি হতে পরী, তাহলে আজ আমার মা-বাবাকে এত কষ্ট দিতে হতো না।

হঠাৎ কী হলো কে জানে, ছোট্ট মেঘটা কেঁপে উঠল, তারপর বাঘের মতো গর্জন করল। কাছেই আর একটা মেঘ এসে হাজির হয়েছে কখন। সেটাও ছোটো মেঘ। দুই মেঘের মধ্যে সংস্পর্শ হতে না হতেই বিদ্যুৎ চমকাল। তারপর হুড়মুড় করে ঝরতে লাগল বৃষ্টি।

এ কী! এ কী! করে চেঁচিয়ে উঠল জয়মঙ্গল। মেঘ গলে জল হয়ে যাচ্ছে। তারপরই নিরালম্ব শূন্য।

পরী! পরী! বলে আর্তনাদ করে ওঠে জয়মঙ্গল।

কিন্তু কেউ তাকে ধরল না। জয়মঙ্গল নিচে পড়ে যেতে লাগল।

এক মাস বাদে শুভদৃষ্টির সময় জয়মঙ্গল চোখের পলক ফেলতে ভুলে গেল। সামনে পরী। ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে আছে তার দিকে।

জীবন

তৃতীয় ব্যক্তি

সব সময়েই এই তৃতীয় ব্যক্তিটি এসে আমার সব কাজে নাক গলায়। মুশকিল এই লোকটিকে আমি কখনো ধরতে পারিনি হাতে নাতে। আসলে তো যে কোন লোক নয়। অশরীরি প্রেত, দুষ্টু বাতাস, কুপিত গ্রহ কিংবা আমারই অন্তর্নিহিত কোন প্রবৃত্তিজাত দুর্বলতা, তাকে দেখা বা ধরা না যাক টের পাওয়া যাবেই।

রাতে শোবার ঘরে দেখি, পাখা বন্ধ, গরম লাগছিল বলে যেই পাখা চালাতে গেছি অমনি স্ত্রী বললেন, পাখা চালিয়ো না, আমার গায়ে কাঁটা-কাঁটা দিচ্ছে।

এ প্রায়-দিনের ঘটনা, স্ত্রীর ইসিনোফেলিয়া আছে বলে গ্রীষ্মেও একটা শীত শীতভাব টের পান, দুর্জয় গরমেও মাঝে মাঝে গায়ে চাদর ঢাকা দিয়ে তাতে শুতে হয়।

কিন্তু সারাদিনের পরিশ্রমের পর আমার অসম্ভব গরম লাগছে। ঘামও হয় প্রচণ্ড। তাই বললাম, আচ্ছা, আস্তে চালাই বরং। তুমিও গায়ে একটা ঢাকা দাও।

বেশ ভাল কথাবার্তা চলছে স্বামী স্ত্রীর, আমার মেয়েটি গভীর ঘুমে, ঘরে আর কেউ কোথাও নেই।

কিন্তু সেই অশরীরি তৃতীয় ব্যক্তিটি ঠিক আড়াল থেকে হেসে উঠল।

স্ত্রী ঈষৎ বিরক্ত স্বরে বলল, তুমি সব সময়ে ছোটখাট ব্যাপারেও জোর খাটাও কেন বল তো! বলছি পাখা চালালে আমার শীত করে।

আমি বলি পাখা না চালালে যে গরমে আমার ঘুম হবে না! শুধু তোমার নিজের দিকটা দেখলেই তো হবে না!

স্ত্রী বললেন, নিজের দিকটা আমি দেখি না তোমরা দেখ?

পাঠক, লক্ষ্য করবেন স্ত্রী তুমি না বলে তোমরা বলেছেন, অর্থাৎ

এখন আমি নই, আমার গোটা পরিবারটাই তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য বস্তু।

আমি অত্যন্ত অভদ্র গলায় বলি, পাখা আমি চালাবই। তুমি দরকার হলে ওঘরে গিয়ে শুতে পারো।

স্ত্রী অত্যন্ত তিক্তস্বরে বলেন, স্বার্থপর। গোটা গুষ্টিটই স্বার্থপরের গুষ্টি। কোনদিন তোমরা কারো সুখ সুবিধে বোঝনি।

আমার স্বাভাবিক মাথা, মেজাজ আত্মনিয়ন্ত্রণ জট পাকিয়ে গেল। হঠাৎ হু-হুঙ্কারে বলে উঠি, মুখ সামলে কথা বলবে। আমার গুষ্টি তুলে কথা বললে জুতিয়ে—

বলা বাহুল্য, এরপর যা ঘটল তা আমার বা আমার স্ত্রীর স্বাভাবিক জীবনের ঘটনা নয়। সম্পূর্ণ তৃতীয় পক্ষ যেন এসে আমাদের দুজনের ঘাড়ে ভর করল।

তিন দিন উপোসে কাটল আমার। বাড়িতে প্রায় অরন্ধন। কথাবার্তা ও সব রকম সম্পর্ক বন্ধ।

টার্মিনাস থেকে বাসে উঠেছি। জানালার ধারে একটা বাছাই সীটে গ্যাঁট হয়ে বসে আধা-প্রাকৃতিক, আধা-নাগরিক দৃশ্য দেখতে দেখতে বেশ যাচ্ছি, হঠাৎ টের পাই, পাশে এক অতিশয় বৃদ্ধ মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। চোখে বোতল ভাঙা কাচের তলানীর মত মোটা কাচের চশমা। রোগা, অশক্ত চেহারা। মুখখানায় শারীরিক নানা কষ্টের ছাপ পড়েছে! ভীড় তাঁকে একবার এদিকে ঠেলছে, একবার ওদিক। কয়েকবার পড়ো পড়ো হতে গিয়ে সামলে গেলেন।

হঠাৎ মনে মনে নীতিবোধের বুদবুদ উঠতে লাগল—না বুড়ো মানুষটিকে সীটটা ছেড়ে দিই।

ভাবতে না ভাবতেই শরীরটাকে কে যেন ঠেলা দিতে লাগল। উঠে পড়ি আর কি!

অমনি তৃতীয় ব্যক্তির ঘনায়মান অস্তিত্ব টের পাই। সে আমাকে চেপে ধরে বলে—উঠবে কেন? বুড়ো লোকটা তো বাসে ভীড় দেখেই উঠেছে। এ বাসে উঠলে যে দাঁড়িয়ে যেতে হবে এ কি ওর জানা ছিল না?

আমি বলি, তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু ফাঁকা বাসই বা পাবে কোথায়? অফিস টাইমের ভীড়ে সব বাসই তো এ রকম। লোকটার হয়তো যাওয়াটা জরুরী, তাই বাধ্য হয়ে উঠতে হয়েছে।

বুড়ো লোকদের ওরকম বাসে ওঠাই অন্যায়। আর যদি উঠেছেই, তবে কখনো তার আশা করা উচিত নয় যে, একজন কেউ না কেউ তাকে বসবার জায়গা ছেড়ে দেবে।

লোকটা কষ্ট পাচ্ছে হে। আমরাও তো বুড়ো হব।

তুমি বসে থাক তো। তুমি ছাড়া আর কারো তো এত চুলকুনি দেখছি না; একা মহৎ হয়ে কি করবে? আর পাঁচজন যখন ছাড়ছে না, তুমিও ছেড়ো না।

কথাটা আমার যুক্তিযুক্তই মনে হয়। আমি তো একাই বসে নেই। আরো অনেকে বসে আছে। তারা ছাড়বে না আমিই বা কেন তাহলে সীট ছাড়ব! কিন্তু মনে তবু অস্বস্তি হতেই থাকে। বুড়ো মানুষটির দিকে তাকানোই ভুল হয়েছে। এবার থেকে যখন জানালার পাশে বসব তখন কিছুতেই আর বাসের ভিতরের দিকটা লক্ষ্য করব না। আগাগোড়া বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকব ঘাড় শক্ত করে।

ঠিক এ সময়ে আমার পিছনের সীটে একজন প্রৌঢ় বলে উঠলেন, ও দাদা, আপনি এসে আমার জায়গায় বসুন। এই বলে বুড়ো মানুষটিকে ডেকে তিনি উঠে দাঁড়ান। বুড়ো কয়েকবার একটু মৃদু আপত্তি তুলতে, আশপাশের লোকজন বলে, যান দাদা, বসে পড়ুন। বুড়ো মানুষ কষ্ট পাচ্ছেন দাঁড়িয়ে।

বুড়ো বসে। প্রৌঢ়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার বুকটা ভরে ওঠে। বুড়ো আর কিছুক্ষণ ওরকম ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে আমার অস্বস্তি বেড়ে যেত।

মনে মনে তৃতীয় লোকটাকে ডেকে বলি, তুমি আমাকে নিজের কাছে মহৎ হতে দিলে না। জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলে আমার একটু কষ্ট হত ঠিকই, কিন্তু নিজের প্রতি আমার কিছু শ্রদ্ধা জন্মাত।

তৃতীয় ব্যক্তি উত্তর দিল না। পালিয়েছে।

বিদেশের বন্ধু

আমার পরিচিতদের মধ্যে অনেকেই এদেশের পাট চুকিয়ে বিদেশে গিয়ে আস্তানা গেড়েছে। কেউ ইংল্যান্ডে, কেউ আমেরিকায়, কেউ বা ইউরোপের অন্য কোন দেশে।

দীর্ঘদিন বাদে ইংল্যান্ডের প্রবাসী একজন কয়েক দিনের জন্যে

এসেছেন। এক সময়ে সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর কিছু খ্যাতি ছিল।

দেখা হতেই জিজ্ঞেস করি, আরে সুমিত! লেখা-টেখা কেমন চলছে?

সুমিত বিস্ময় ভরে বলে, লেখা! সে তো কবে ছেড়ে দিয়েছি!

বেকুব আমি। গত বিশ বছর ধরে খেয়ে না খেয়ে বামনের চাঁদ ধরবার মতো বৃথা চেষ্টায় লেখালেখি, চালিয়ে যাচ্ছি। লেখক-সাহিত্যিক কিছুই হতে পারিনি বটে, তবে লেখালেখির চিন্তাতেই সর্বদা মাথাটা ভরাট থাকে। তাই, কেউ লেখা ছেড়ে দিয়েছে শুনলে চমকে যাই, ভয় পাই, ভাবি, লেখা ছাড়া বেঁচে থাকবে কি করে?

তাই দুঃখের সঙ্গে বলি, লেখা ছেড়ে দিলেন? কেন, বলুন তো! আপনার লেখা এখনো আমাকে হন্ট্ করে।

সুমিত হেসে উঠে বলে, লেখা-ফেখা একটা ছেলেমানুষী ব্যাপার। কোন মানেই হয় না। দেশে ফিরে এসে দেখছি, বন্ধুবান্ধবরা অনেকেই খুব সিরিয়াসলি লিখছে। কিছুই হচ্ছে না। আমি সেটা অনেক আগেই বুঝতে পেরে লেখার পণ্ডশ্রম বন্ধ করে দিয়েছি। এখন ভাবছি মিক্সড্ মিডিয়া নিয়ে কিছু করা যায় কিনা। ওদেশে যারা খুব সিরিয়াস তারা এখন মিক্সড্ মিডিয়া নিয়েই ভাবছে।

সেটা কি?

ধরুন, কবিতা এবং ফিল্মকে এক করে তোলা যায় কিনা। কিংবা, পেইন্টিংয়ের সঙ্গে মিউজিককে পাঞ্চ করা। ভারী অদ্ভুত ব্যাপার। ওদেশে কয়েকজন যা দারুণ কাজ করেছে এ সবের ওপর, ভাবা যায় না।

বিষণ্ণ মুখে বলি, আমার তো মনে হয় আপনার সবচেয়ে ভাল মিডিয়া ছিল কবিতা। কি দারুণ লিখতেন আপনি!

সে সব ছিল কম বয়সের ছেলেমানুষী, ওদেশে না গেলে ও ব্যাপারে আমার চোখ খুলত না। গিয়ে বুঝেছি, এসব কবিতা-টবিতা আসলে কোন ব্যাপারই নয়। আসল ব্যাপার হল—

সুমিত এইখানে থামে এবং কফির অর্ডার দেয়, কালো কফি। বলে, কালো কফি ছাড়া খেতে পারি না।

আমি কিন্তু দুধ চিনি দিয়ে খাব।

সুমিত হেসে বলে, খান। কিন্তু কালো কফির মজাই আলাদা। এদেশে কলার দাম এত বেড়ে গেছে কেন বলুন তো!

দীর্ঘশ্বাস ফেলি।

সুমিত কালো কফিতে চুমুক দিয়ে বলে, আপনারা খুব লিখছেন শুনলাম। কেন লিখছেন বলুন তো? এদেশে তো চাকর-বাকররা সাহিত্য পড়ছে আজকাল। মনে রাখবেন, খ্যাতিটাও একটা অপমান। আমি করুণ স্বরে বলি, আমার সে অপমানটা এখনো অর্জন করা হয়নি।

দূর মশাই! সুমিত সব প্রসঙ্গ উড়িয়ে দিয়ে বলে, মিক্সড্ মিডিয়ার কাজ যখন শুরু হবে ফুল ফ্লেজেড়লি তখন দেখবেন, এতকাল আপনারা কী ছেলেমানুষীটাই না করেছেন!

সেবার নবীন পাল লেনের বিতিকিচ্ছিরি বোর্ডিং হাউস ছেড়ে গোলপার্কের কাছে কেয়াতলার মোড়ে একটা চমৎকার বাড়িতে নিজেরা মেস করে চলে এলাম। কমপ্যাক্ট ফ্ল্যাট বাড়ি, অভিজাত পাড়া। নিজেদের বেশ অভিজাত অভিজাত লাগে তখন। কোথায় থাকি, তা কেউ জিজ্ঞেস করলে একটু অহংকারের সঙ্গে জবাব দিই—পূর্ণ দাস রোডে।

ভাড়া করা টেবিল চেয়ার, জানালার পর্দায় বেশ ঝলমলে ঘরদোর। বাইরে থেকে পরিচিত লোকজন ধরে এনে নিজেদের ঘরদোর দেখাতাম।

সেই সময় আমার বন্ধু অমল ফিরল আমেরিকা থেকে। সে এক সময়ে আমার নবীন পাল লেনের জঘন্য মেসের ঘরে দিনের পর দিন কাটিয়েছে।

নানারকম কথাবার্তার ফাঁকে বললাম, অমল, এখন একটু ভাল স্ট্যান্ডার্ডে আছি আমরা, না রে?

অমল হো-হো করে হেসে বলল, এই যদি ভাল স্ট্যান্ডার্ডের নমুনা হয় তবে আমেরিকার স্লামগুলো তো স্বর্গ।

বাতাস গিলে ফেলি হতাশায়। বলি, সে তো ঠিকই। আমেরিকার তুলনায় তো তেমন কিছু নয়।

অমল বলল, শোন, থাকতে হয় তো থাকবি আমেরিকানদের মত। যাকে বলে গুড লিভিং। আর নয় তো সবচেয়ে ভাল হয় যদি কুটিরে থাকতে পারিস। মাটির দাওয়া, বড় উঠোন, কৃষি—ইলেকট্রিক-ফিলেকট্রিক চলবে না।

কলকাতায় কুটির ?

কলকাতায় থাকিস কেন ? বাইরে চলে যা।

কিন্তু চাকরি ?

চাকরি-চাকরি করেই গেলি। কৃষি কর কৃষি কর। আমার এক মার্কিন বন্ধু প্রায়ই বলত, অমল, অটোমোবিল কিনেছ কেন ? তার চেয়ে হাতি কেন। হাতিতে চড়া খুব ভাল।

শহরে হাতি ?

শহর-শহর করে গেলি। শহরে কি আছে ? গ্রামের দিকে চলে যা। কুটিরে বাস কর। কৃষি কর, হাতিতে চড়ে ঘুরে বেড়া।

মাথাটা কেমন লাগছিল।

অমল চারশো টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট ভাড়া করল। হাতে তখন তার বেশ কিছু টাকা। প্রচুর আসবাব ভাড়া করল। পার্টি দিতে লাগল প্রায়ই। ওদিকে আমেরিকা থেকে তাকে স্থায়ী ভাবে চলে আসতে হয়েছে বলে সে একটা ভাল চাকরিও খুঁজছিল। কয়েকটা পেলও, কিন্তু দু'হাজার টাকার কম মাইনে বলে সে চাকরি নেবে না বলে নিল না।

তিন বছরের মধ্যে তাকে বেচে দিতে হল ইলেকট্রিক সেলাই মেশিন, গ্রুপিগের রেডিওগ্রাম, টেপ রেকর্ডার, প্রোজেক্টার, ক্যামেরা, এক সেট এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, আশি টাকা ভাড়ায় শহরগুলির বাসা-বাড়িতে উঠে গেল। প্রায়ই বলত, এ দেশে আমার কিছু হওয়ার নয়, আবার আমেরিকায় চলে যেতে হবে দেখছি।

কিন্তু যাব বললেই কি যাওয়া হয় ? অমলেরও হল না। ইদানীং বড় রোগা হয়ে গেছে। কাজ-টাজ নেই। উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পেট চালানোর জন্যে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখনো বলে, আমি বুঝতে পারছি, এ দেশ পচে গেছে। মানুষ আছে একমাত্র আমেরিকাতেই।

কখন যেন তার বাস্তবের আমেরিকা স্বপ্নের আমেরিকা হয়ে গেছে।

মাছ মাংস

শুভানুধ্যায়ীরা অধিকাংশই শুনে আঁতকে উঠে বলেন, মাছ মাংস খাও না ? বল কি ! কেন ? ধর্ম করতে গিয়ে মাছ মাংস ছেড়েছ ?

সে আবার কেমন কথা! বিবেকানন্দ স্বয়ং খেতেন, রামকৃষ্ণদেবও খেতেন। তোমরা আবার এ কি ভেক ধরলে? তাঁদের চেয়ে কি তোমরা বেশী ধার্মিক?

বিনীত ভাবে বলি, মাছ মাংস খেলে শরীরে টকসিন ডিপোজিট বেশী হয়, শরীর-বিজ্ঞানীরাও জানেন, টকসিন হল মানুষের শরীরের স্বভাবজ বিষ। বিবেকানন্দ বলতেন, নিরামিষ আহারই শ্রেষ্ঠ। আমি মাছ মাংস খাই বলেই তাকে ভাল বলতে পারি না। তিনি আরো বলতেন শিষ্যদের—তোরা মাছ মাংস খুব করে খা। পাপ যা হওয়ার আমার হবে। তার মানে মাছ মাংস খেলে যে পাপ হয় তা তাঁর অজানা ছিল না।

ওসব রাখো তো, বিষ! বিষ হলে আর দুনিয়া শুদ্ধু মানুষে খেত না। প্রোটিন পাবে কোত্থেকে শুনি! প্রোটিন ছাড়া মানুষে বাঁচে?

প্রোটিনের অভাবে মরিনি এখনো। দেদার প্রোটিন আছে ডালে, শস্যবীজে, দুধে, শাক-সব্জীতেও।

সে কি মাছ মাংসের মত অত বেশী? একটু করে মাছ খেলে যা হয়, দু'টুকরো মাংসে যা আছে তা পাঁচ সের ডালেও নেই।

ভারতবর্ষের শতকরা ষাট সত্তর ভাগ লোক মাছ মাংস খায় না।

তাদের কথা ছাড়ো, তারা ঘি দুধ খায়।

ঘি দুধ বেশী খেলে রক্তচাপ বাড়তে পারে।

শুভানুধ্যায়ীরা গম্ভীর মুখে বলে, শোন বাপু, এসব কাজের কথা নয়, বাঙালির ছেলের মাছ না খেলে শরীরে রক্ত হয় না। চিরকাল মাছ মাংস খেয়ে এসেছ, এখন হুট করে ছেড়ে দিয়ে শরীরে একটা উৎপাত বাধাবে।

লোকে, বিশেষত, বাঙালিরা যে ভাবে মাছ খায় তাতে প্রোটিন শরীরে যায় না। মাছ ভেজে ঝোলে মশলা দিয়ে তার তেইশটি আগেই মেরে দেয়।

দুত্তোর! কেবল এঁড়ে তর্ক! বলি, প্রোটিনের ব্যাপারটা ছাড়া আরো তো ব্যাপার আছে। এই যে তোমার মেয়ে আর বৌ মাছ মাংস ডিম ছাড়া খেতে পারে না বলে, তাদের কেন বাপু বঞ্চিত করছ। আত্মাকে কষ্ট দিয়ে পস্তাবে। তুমি না খাও, ওদের খেতে দাও।

আত্মা তো কখনো কিছু খেতে চায় না। আত্মার সঙ্গে আমাদের

মোলাকাৎও হয় না। মাছ মাংস খাওয়া ভাল নয় বলে বুঝি, তাই যারা আমার প্রিয়জন তাদেরও জোর করে ভাল রাখার চেষ্টা করি।

এটা অন্যায়। খুব অন্যায়। ওদের প্রোটিন থেকে বঞ্চিত করছ।

আমি বলি, পাঁঠা ছাগলের মাংসে প্রোটিন আছে?

নিশ্চয়ই।

কিন্তু সে প্রোটিন কোত্থেকে আসে? ওরা তো মাছ মাংস খায় না।

তবু। মানে, ওদের হয় তো কনস্টিটিউশন আলাদা।

আমাদেরও তৈরি হয়ে যাবে আলাদা কনস্টিটিউশন।

কিন্তু প্রোটিন পাবে কোত্থেকে?

হাওয়া বাতাস থেকে। শুধু প্রোটিনের জন্যে প্রাণী হত্যা করতে পারব না।

বুঝবে, একদিন ঠেলা বুঝবে। বলে শুভানুধ্যায়ীরা অন্য প্রসঙ্গে যান।

ছাড়পত্র

সকালে মৃদুলা এসে হাজির।

শোন, ভীষণ মুশকিলে পড়েছি। কাল আমার পাসপোর্ট হারিয়ে গেছে। অথচ সামনের সপ্তাহেই আমার ফ্লাইট। ছুটিও নেই।

চোখ কপালে তুলে বলি, সর্বনাশ! পাশপোর্ট হারানো তো খুবই সাংঘাতিক ব্যাপার!

তাই তো তোমার কাছে আসা। এখানে আমার পুরুষ সাহায্যকারী কেউ নেই। তুমি ছাড়া।

আমি মৃদুলার মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা ভাবি। আমি ওর সাহায্যকারী, এ কথা ভাবতে আমার একটু কষ্ট হল। মৃদুলার সঙ্গে প্রায় বছর আটেক আগে আমার বিয়ে হয়। অসম বিয়ে। আমি ছিলাম সামান্য সরকারী অফিসার। মৃদুলা তখন সায়েন্স কলেজের দুর্দান্ত ছাত্রী। ফিজিক্সে এম এস. সি. করেছে রেকর্ড ভাঙা নম্বর পেয়ে। রিসার্চ করছিল। এমন সময় কানাডা থেকে স্কলারশিপ পেল। বিদেশ যাওয়ার আগেই ওর সেকেলে বাপ মা জোর করে বিয়ে দিয়ে দেয়। আর সেই বলির পাঁঠাটি ছিলাম আমি। বিয়ের দু'মাসের মাথায় মৃদুলা বাইরে চলে গেল, আমি পড়ে রইলাম। স্বভাবতই আমাকে মৃদুলার পছন্দ হয়নি। না হওয়াই স্বাভাবিক। আমাদের মধ্যে চিঠি চালাচালি কিছুদিন বজায় রইল। তারপর সেই যোগ খুবই ক্ষীণ হয়ে গেল। এ সবই অতি স্বাভাবিক নিয়মে। যেন এরকম হবে বলেই আমারও একটা আঁচ করা ছিল। বিয়ের সময় এবং পরবর্তী ছ'মাসে মৃদুলার সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্র ঘনিষ্ঠতা হয়নি, শরীরের সম্পর্কও নয়। ওর ঐ দুর্দান্ত ক্যারিয়ারের জন্যই আমি ওর কাছে ঘেঁষতে সাহস পেতাম না। আমি বড়ই কাপুরুষ।

কানাডা থেকে বছর তিনেক বাদে একদিন ফিরে এলো মৃদুলা এবং আমাকে বিবাহ বিচ্ছেদের নোটিশ দিল। তার আগে অবশ্য

আমার কাছে এসে স্নেহভরে আমাকে বোঝাল, এই বিয়েটা জিইয়ে রাখার কোন মানেই হয় না। কারণ, আমরা কেউ কাউকে কোন দিনই পাব না। আমাদের মধ্যে ভালবাসার গভীরতা নেই। সুতরাং আমি যেন মিউচুয়েল সেপারেশনে রাজি হই। বলতে নেই একটু দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু মৃদুলাকে আটক করার কোন মানেও তো হয় না। আমি তাই ওর মতে মত দিলাম। আদালত আমাদের বিচ্ছেদ মঞ্জুর করে দিল।

শুনেছি মৃদুলা কানাডায় এক সাহেব অধ্যাপককে বিয়ে করেছে। দুজনেই অত্যন্ত জ্ঞানী পণ্ডিত। ভালোই আছে। দুই পড়ুয়ায় মিল ঘটেছে। আমার নিজের কপাল অতটা ভালো নয়। মৃদুলা আমাকে পছন্দ না করায় আমি কাপুরুষ হয়ে যাই এবং দ্বিতীয়বার বিয়ে করার সাহসটুকুও আমার লোপ পায়। বাড়ির লোকেরা এই নিয়ে ঝামেলা করায় আমি বাড়ি ছেড়ে আলাদা একটা ঘর নিয়ে বসবাস করি। একরকম কেটে যায়। মৃদুলার সঙ্গে অবশ্য বরাবরই আমার চিঠিপত্রের যোগাযোগ ছিল। আমি একটা চিঠি দিই মাসে বা দু'মাস অন্তর। ওরও ঐরকম দেরীতে জবাব আসে। আমরা তো পরস্পরকে ঘৃণা করিনি, শুধু ভালোবাসতে পারিনি মাত্র।

এবারও মৃদুলা এসে আমার সঙ্গে দেখা করেছে। একটা বিদেশী ছাতা, একটা সোয়েটার আর হাতঘড়ি দিয়েছে। আমি ওকে সিল্কের শাড়ি আর পোড়া মাটির পুতুল কিনে দিয়েছি।

পাসপোর্ট হারানোর খবরে আমি বিচলিত হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে বলি, কী করতে হবে বল। যা সাহায্য চাও সবই করব।

ও চিন্তিত ভাবে বলল, এ দেশের থানা পুলিশ খুব কো-অপারেটিভ নয়। তুমি তো সরকারী কাজ কর, তোমার ইনফ্লুয়েন্স অনেক কাজ করবে।

ঘর থেকে মৃদুলা বলে, বুঝতে পারছি না। কাল অনেকের সঙ্গে দেখা করতে হয়েছে। ট্রানজিশনে ট্যাক্সি বা মিনিবাস বা রাস্তায় পড়ে গেছে বোধ হয়। এ দেশের লোকও ভীষণ দায়িত্বহীন। পাসপোর্ট পেলে যে ফেরৎ দিতে হয় তাই হয়তো জানে না।

কথাটা সত্যি। পাসপোর্ট হয়তো অনেকে চেনেও না, পেলে সেটা নিয়ে কী করতে হবে তা মাথায় ঢোকার কথাও নয়। আমি বললাম, খুবই মুশকিল।

মৃদুলাদের বাড়ি টালিগঞ্জে। ডিভোর্সের পর ওর মা বাবা ওকে বাড়িতে প্রথম প্রথম ঠাঁই দিত না। এখন দেয়। মানুষ তো সব কিছুই সহ্য করতে পারে।

আমরা ট্যাক্সি নিয়ে টালিগঞ্জ থানায় হানা দিলাম।

একজন সাব ইন্সপেক্টর মনোযোগ দিয়ে আমাদের কথা শুনে বললেন, কিন্তু আমাদের এরিয়ায় যদি না হারিয়ে থাকে তবে আমরা ডায়েরী নিই কি করে? আমি বিপন্ন মুখে বললাম, তাহলে?

উনি বললেন, তাহলে লালবাজারে চলে যান। ওরা বলতে পারবে।

গেলাম লালবাজারে। এখানেও একজন গোমড়ামুখো লোক সব শুনে বললেন, আগে কোন থানায় ডায়েরী করিয়ে আসুন। আমরা ডাইরেক্টলি নিতে পারি না।

কোন থানায়?

যে থানার এরিয়ায় হারিয়েছে।

কিন্তু সেটা তো বলা যাচ্ছে না।

মনে করার চেষ্টা করুন।

আবার বেরোলাম। ট্যাক্সিতে বসে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কোন কিছু মনে পড়ছে না?

মৃদুলা ভ্রূ কুঁচকে বলে, মনে পড়লে তো হয়েই যেত।

আমি বললাম তাহলে চল, একটার পর একটা থানায় হানা দিই।

একটু বিস্ময় ও বিরক্তির সঙ্গে মৃদুলা বলে তোমার কোন ইনফ্লুয়েন্স নেই? কোন মিনিস্টারের সঙ্গে জানা-শোনা?

আমি যে কত বড় অপদার্থ তা মৃদুলা জানে না। অফিস থেকে ঘর আর ঘর থেকে অফিস ছাড়া আজকাল আমার কোন পরিধিই নেই। আমরা মুচিপাড়া, কড়েয়া, হেয়ার স্ট্রীট একের পর এক ফাঁড়িতে হানা দিই। কেউ বলল খোঁজ পেলে জানাবে। কেউ অন্য থানায় যেতে পরামর্শ দিল। কেউ বলল, ও বাবা, ও হারালে জেল। বেলা যথেষ্ট গড়িয়ে গেছে। মৃদুলা বলল, ভীষণ খিদে পেয়েছে। চল, কোথাও কিছু খেয়ে নিই।

আমরা পার্ক স্ট্রীটের কেতাদুরস্ত এক রেস্টুরেন্টে ঢুকে খেতে বসি।

মৃদুলা হেসে বলে, ব্যবস্থা একটা নিশ্চয় হবে, হয়তো সামনের

সপ্তাহে যাওয়া হবে না।

তোমার স্বামী চিন্তা করবেন।

তা করবে। তবে ট্রাঙ্ককলে ওকে জানিয়ে দেব।

আমি উদ্বেগের সঙ্গে প্রশ্ন করি, এতে কি জেল হয়?

মৃদুলা মাথা নেড়ে বলে, বিদেশে হারালে হয়। এখানে হয়তো তা হবে না। তবে নানারকম ঝামেলা দেখা দেবে। থাম তো, অত ভেবো না তো, তোমাকে এমনিতেই ভীষণ উদভ্রান্ত দেখাচ্ছে। তুমি কি শুয়োরের মাংস খাও?

আমি অবাক হয়ে বলি, কেন?

তাহলে হট ডগ খেতে পারো।

কখনো খাইনি, তবে খেতে আপত্তি নেই।

ও বেয়ারাকে তিন চার রকম খাবারের কথা বলে দিল। তারপর একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, উঃ, আমিও বোধহয় হাঁফাচ্ছি।

আমি মাথা নাড়ালাম হ্যাঁ।

খেতে খেতে হঠাৎ আমার কানুর কথা মনে পড়ে গেল। কত ইম্পর্ট্যান্ট পোস্টে কত না ঘনিষ্ঠ লোক বসে থাকে। কিন্তু সময়কালে মনে পড়ে না। মনে পড়তেই লাফিয়ে উঠলাম আরে! কানুর কাছে গেলে হয়?

সে কে?

আমার জ্যেঠতুতো ভাই। কানু। আমাদের বাসর ঘরে যে তোমাকে জুলু নাচ দেখিয়েছিল বলে তুমি ভীষণ রেগে গিয়েছিলে।

মৃদুলা বিরক্তির স্বরে বলে, আচ্ছা না হয় হল। আগে খেয়ে তো নেবে।

আমি সে কথায় কান না দিয়ে দৌড়ে গিয়ে কাউণ্টার থেকে রাইটার্সে ফোন করি এবং ভাগ্যক্রমে কানুকে পেয়ে যাই।

কানু! আরে শোন, মৃদুলার পাসপোর্ট হারিয়েছে, ভীষণ বিপদ।

কানু হুংকার দিল, মৃদুলাটা কে?

আরে—ঐ যে—যে সেই মৃদুলা যার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল।

বিদুষী ভার্যা! হাঃ হাঃ! তার সঙ্গে তোমার এখন কিসের সম্পর্ক?

উই আর ফ্রেন্ডস। শোন না ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস। ও এখানে আটকা পড়ে যাচ্ছে, ওদিকে প্লেনের টিকিট কাটা রয়েছে।

কিছু বুঝতে পারছি না, আরও স্পেসিফিক ভাবে বল।

বললাম, কানু শুনল, তারপর বলল, দেখি কী করা যায়।

করা যায় না, করতেই হবে। পুলিশ চেষ্টা করলে সব পারে।

চেষ্টা করব, পরশু খোঁজ নিও।

আমি ফিরে এসে মৃদুলাকে বললাম, মনে হচ্ছে পেয়ে যাবে।

মৃদুলা চামচ তুলে বসেছিল। আমি ফিরে আসার পর আবার একসঙ্গে খেতে লাগলাম। ভারী ভালো লাগছিল আমার।

পাওয়া গেলেও, পরশু নয়, পরদিনই লালবাজার থেকে একটা জীপ ভোরবেলা গিয়ে মৃদুলার বাড়িতে পাসপোর্ট পৌঁছে দিল।

মৃদুলা অফিসে ফোন করে আমাকে বলল, তোমার ভাই আমার পাসপোর্ট উদ্ধার করেছেন। তোমার ভাইকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে দিও। আমি সামনের সপ্তাহে চলে যাচ্ছি।

সেটা তো আগেই বলেছ।

বলেছি ও হ্যাঁ, তাই তো।

কালকেই বলেছিলে। তোমার স্বামীকে ট্রাঙ্ককল করেছ?

না তো। দরকার হয়নি। আজই হয়তো করতাম। কিন্তু এটা পেয়ে গেলাম যে। যেন খুব বিপদে পড়েছে এমন শোনাল মৃদুলার গলা।

বললাম, ঠিকই তো, এটা নিয়ে আর বেরিও না। আবার হারালে লোকে সন্দেহ করবে, বোধহয় ইচ্ছে করে হারাচ্ছি।

কেন? সন্দেহ করবে কেন?

আমার নিজেরই যে ওরকম সন্দেহ হয়। বলেই মৃদুলা ফোন রেখে দিল।

কথাটার মানে ঠিক বুঝলাম না। তবে মনে হল, এর চেয়ে ভালো কথা জীবনে শুনিনি।

পীতাম্বর

পীতাম্বর লোকটা বাস্তবিকই ভারী দুঃখী, দুঃখটা শুরু হয়েছিল জন্মানোর পর থেকেই। তবে দিনে দিনে তা ফুলে ফেঁপে উঠছে। ছেলেবেলাতেই বাপ আর মা পরপর গায়েব হয়ে গেল। বেঁচে থাকতে হল এক খুড়োর সংসারে। দূর-ছাই লাথি-ঝাঁটা খেতে খেতে আর রাজ্যের চাকরের কাজ করতে করতেও পীতাম্বর বড় হয়ে একটা কেওকেটা হওয়ার স্বপ্ন দেখত, তাই লেখাপড়াটা ওর মধ্যেই চালিয়ে গেছে। অঙ্কে সাফ মাথা ছিল, তাই টপাটপ পাশ-টাশ করে যেত। বি. এস-সি পাশ করে ফেলল অনার্স সমেত। তারপর খুড়োর সংসার টানতে হলো। টিউশানি করে ছোটোখাটো ব্যবসা করে কায়ক্লেশে। শেষ অবধি একটা মাঝারি চাকুরি জুটল আর খুড়িমা তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে নিজের এক দজ্জাল বোনঝিকে ঝুলিয়ে দিলেন গলায়। কুসুম, কুসুম তাকে প্রথম থেকেই কী চোখে দেখল কে জানে। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বউয়ের কাছে আর হেনস্থার অবধি রইল না পীতাম্বরের। পীতাম্বরের চাকরিটা শুধু চাকরিই নয়, তার পালিয়ে থাকার এক নিরাপদ জায়গাও বটে। তাই পীতাম্বর অফিস-ছুটির পরও বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে কাজ করে। কাজে তাই তার খুব সুনাম। ছুটি-ছাটাও নেয় না। কখনও। এর জন্যেই বউ কুসুম তাকে ঝাঁপা-ঝাঁপা করে রোজ। শুধু তাই নয়, কুসুমের জ্বালায় খুড়ো আর খুড়ীমাও অতিষ্ট হয়ে পড়ল। নিতান্তই পীতাম্বরের রোজগারে খেতে হয় বলে কোনওক্রমে মুখ বুজে তাঁরা পড়ে থাকেন।

একদিন অফিস থেকে ফিরতে একটু বেশী দেরীই করে ফেলল পীতাম্বর। সেদিন কুসুম এমন সব কথা বলল যাতে মড়া জেগে ওঠে। যার গায়ে মানুষের চামড়া আছে সে ও-সব কথা সইতে পারে না।

পীতাম্বরও পারল না। সে ঠিক করে ফেলল, আত্মহত্যা করবে।

ঠিক করে ফেলার পর মনটা একটু ঠাণ্ডা হল। কোন উপায়ে আত্মহত্যা করলে সুবিধা হয় তাই ভাবতে ভাবতে রাতটা কাটিয়ে দিল।

তার অফিসে একটা লোক প্রায়ই নানারকম মশলা বিক্রি করতে আসে। বীট নুনে জরানো আমলকি বা জোয়ান, শুকনো আদা, আমচুর। আর নানারকম জড়িবুটিও যে তার কাছে থাকে তাও সে বলে। তবে জড়িবুটি কেউ কেনে না, সুস্বাদ মশলা অনেকেই কেনে। পীতাম্বরও কিনেছে কয়েকবার।

আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেওয়ার দু-একদিন পরই লোকটা পীতাম্বরের অফিসে মশলা বিক্রি করতে এল।

পীতাম্বর তাকে ডেকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করল, কেউটে সাপের বিষ আছে?

লোকটা একটু অবাক হয়ে বলল, কেন বলুনতো!

এই একটু দরকার আছে। ইয়ে মানে একটা ওষুধ বানাবে একজন, তাই খুঁজছে।

লোকটা গম্ভীর মুখে বলল, বিষ পাবেন। তবে দাম চড়া।

কত করে?

এক ভরি চারশো টাকার মতো।

ও বাবা, বেশ দাম দেখছি।

দাম বেশী তবে খাঁটি বিষ ওষুধে লাগে রত্তি খানেক। সাপ তো মাত্র দু-এক ফোঁটা বিষই কামড়ানোর সময় ঢালে। কিন্তু ওই দু-এক ফোঁটারই যা ক্রিয়া।

তাও বটে। আমাকে একটু দিন তো।

লোকটা হঠাৎ ফিক করে একটু হেসে বলল, সাপের বিষ খেলে কিন্তু লোক মরে না।

অ্যাঁ।

আজ্ঞে হ্যাঁ। এর ক্রিয়া হয় রক্তের সঙ্গে। তবে যদি পেটে আলসার থাকে তবে অন্য কথা।

পীতাম্বরের মনের বাসনা যে লোকটা টের পেয়ে গেছে তাতে সন্দেহ নেই। লোকটা খুবই চালাক। পীতাম্বর লজ্জা পেয়ে সবেগে মাথা নেড়ে বলল, না না, মরার কথা ওঠে কেন? ওষুধের জন্য একজন চাইছিল, তাই লোকটা তার কাঁধের ঝোলার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ছোট্ট একটা শিশি বের করে দিল। তাতে সামান্য একটু তলানী

জিনিস। লোকটা বলল, দশটা টাকা লাগবে। পীতাম্বর শিশিটা তার ড্রয়ারে রেখে দশ টাকা দিয়ে লোকটাকে বিদেয় করল।

পীতাম্বর বিজ্ঞানের ছাত্র। সাপের বিষ খেয়ে ফেললে যে লোকে মরে না তা সে ভালোই জানে। কাজেই সে আপনমনে একটু হাসল।

অফিস ছুটি হয়ে যাওয়ার পর পীতাম্বর বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল। অফিস ফাঁকা হয়ে যাওয়ার পর সে একটা সাদা কাগজে পরিষ্কার করে লিখল, 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। পীতাম্বর রায়'। লিখে তারিখ বসাল এবং ফের পড়ে দেখল।

ড্রয়ার থেকে একটা পেন্সিল কাটার পুরোনো ব্লেড বের করে পীতাম্বর তার বাঁ হাতে কব্জীর কাছে সামান্য একটু জায়গা চিরে ফেলল। বেশ বড় বড় ফোঁটার রক্ত পড়তে লাগল।

পীতাম্বর ঘাবড়াল না। বিষের শিশিটার ছিপি খুলে ক্ষতস্হানে সাবধানে ঢেলে রুমাল দিয়ে জারগাটা চেপে ধরল। বেশ জ্বালা করে উঠল জায়গাটা।

মিনিট দশেক চুপচাপ বসে রইল পীতাম্বর। তেমন কিছু পরিবর্তন সে টের পেল না।

তারপর হঠাৎ তার মনে হল, একটা কিছু ঘটছে। কী ঘটছে তা প্রথমটায় বুঝতে পারল না পীতাম্বর। তবে যা ঘটছে তা আর শরীরের মধ্যে নয়। ঘটছে বাইরে।

পীতাম্বর খুব বড় বড় পলকহীন চোখে চেয়ে দেখতে লাগল, তার চারিদিকে অফিস বাড়িটার দেয়ালগুলো যেন ধীরে ধীরে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। সামনের টেবিল, কাগজপত্র, আলমারি সব ঝাপসা হয়ে ক্রমে অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল। তার বদলে চারিদিকে দেখা যেতে লাগল কিম্ভুত সব জিনিস।

পীতাম্বর হঠাৎ টের পেল সে যে চেয়ারটায় বসে আছে সেটা নেই। তবু সে বসে আছে ঠিকই, এবার যার ওপর বসে আছে সেটাও খুব নরম আর আরামপ্রদ।

পীতাম্বর পড়ল না। আসলে সে পড়তে পারছিলও না। তার চারিদিকে আর একখানা ঘর ধীরে ধীরে জেগে উঠল বাতাস থেকে। তবে এ ঘরখানা সাদামাটা অফিস ঘর নয়। দেয়ালগুলো ঘষা কাচের মতো, কিন্তু কবে যে নয় তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। চারদিকে নানারকম প্যানেল। তাতে জ্বলন্ত সব অক্ষরে ফুটে উঠেই মিলিয়ে

যাচ্ছে। ঘরের মাঝখান দিয়ে সরীসৃপের মতো কনভেয়ার বেল্ট বলে চলেছে। এক বন্ধ দরজা থেকে অন্য বন্ধ দরজা অবধি। তারপর দরজা ভেদ করে যাচ্ছে আশ্চর্য উপায়ে। টেবিল চেয়ার কিছু দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু শূন্যে স্থির ভেসে আছে সাজানো ফাইল, কাগজ, লেখার সরঞ্জাম।

এটা কি কোনও অফিস ঘর? কী রকম অফিস?

একটা মৃদু গলার স্বর হঠাৎ খুব কাছ থেকে বলে উঠল, চোদ্দ নম্বর ফাইলটা ক্লিয়ার করুন।

চোদ্দ নম্বর ফাইলটা কী বস্তু তা পীতাম্বর জানে না। কিন্তু সে তার নিজের সামনে কয়েকটা ফাইল দেখতে পেল। শূন্যে ভেসে আছে।

সে হাত বাড়িয়ে ফাইলগুলো তুলে নিয়ে দেখল। ফাইলগুলো খুবই হালকা। প্লাস্টিকের মত কোন জিনিস দিয়ে তৈরি। ফাইল খুলে দেখল, তার মধ্যে কাগজের মতই, কিন্তু তার চেয়ে অনেক পাতলা সব সীট। একটা ফাইলের ওপর লাল জ্বলজ্বলে চোদ্দ নম্বর দেখে কৌতূহলী হয়ে সে ফাইলটা খুলল। তারপর স্তব্ধ হয়ে গেল।

ফাইলের মাথায় লেখা, ফাইল নম্বর চোদ্দ, যেসব রহস্যের কিনারা হয়নি।

প্রথম লেখাটাতেই চোখ আটকে গেল পীতাম্বরের। হেডিং-এ লেখা পীতাম্বর রায়ের অন্তর্ধান রহস্য। নিচে পরিষ্কার বাংলা ছাপা অক্ষরে লেখা আছে, আড়াইশো বছর আগে তৎকালীন কলকাতা নামক শহরের মধ্যাঞ্চলে একটি অফিসবাড়ি থেকে পীতাম্বর রায় অন্তর্হিত হন। সাক্ষ্য প্রমাণ বলে যে তাঁর চেয়ারের কাছে কয়েক ফোঁটা রক্ত মেঝেয় পড়েছিল। রক্তে ছিল তীব্র কেউটে সাপের বিষ। কিন্তু তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়নি। পীতাম্বরের এই অন্তর্ধানে তাঁর স্ত্রী কুসুম রায় শোকে দুঃখে উন্মাদের মত হয়ে যান। স্বামীর সন্ধান করার জন্য তিনি তৎকালীন সংবাদ ও সরকারকে এমনই উদবেজিত করেন যে, এই ঘটনা নিয়ে বিশাল এক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। শুধু তাই নয়, কুসুম রায় স্বামীর সন্ধানের জন্য দেশ জুড়ে যে আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিলেন তার ফলে তিনি নিজে বিখ্যাত হয়ে পড়েন এবং পরে হয়ে ওঠেন নেত্রী। আরও পরবর্তীকালে

তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত হন। কিন্তু শেষ জীবন অবধি তাঁর একটিই দুঃখ ছিল। সেটা হল তাঁর নিদিষ্ট স্বামী। তিনি প্রায়ই বলতেন, জীবনে স্বামী ছাড়া তাঁর দ্বিতীয় কোনও দেবতা নেই। স্বামীর চরণ স্মরণ করলেই তিনি মনের শক্তি পেয়ে যান। এই পতিপরায়না মহিলা তাঁর স্বামীর সন্ধান চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক টাকার একটি ট্রাস্টও স্থাপন করে যান। কিন্তু···

পীতাম্বরের মাথা ঘুরতে লাগল। হাত থেকে ফাইলটা খসে শন্যে ভাসতে লাগল।

হঠাৎ দেওয়ালের একধারে একটা দরজার মত ফাঁক হল। সেই ফাঁক দিয়ে একটি ভারী ফর্সা ও সুন্দরী যুবতী ঘরে ঢুকল।

কাছে এসে সে নরম স্বরে বলল, স্যার চোদ্দ নম্বর ফাইলটা ক্লিয়ার করতে হবে।

কিসের ক্লিয়ার ?

ফাইলটা আমার ক্লোজ করে দেব।

কেন ?

পীতাম্বর রায় এখন মৃত অতীত। আমাদের সব রকম অত্যাচারী যন্ত্রপাতি দিয়ে আমরা কোথাও তাঁর কোনও স্পন্দন পাইনি।

পীতাম্বর ফাইলটা চেপে ধরে বলল, একটা কথা।

কী কথা ?

আমাদের অতীতচারী যন্ত্রগুলো তো কুসুম রায়ের কাছে কোনও খবর পৌঁছে দিতে পারে !

নিশ্চয়ই স্যার।

তাহলে কুসুম রায়কে একটা বার্তা পাঠিয়ে দিন।

মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে একটা নোটবই বের করল। বলল, বলুন স্যার।

লিখুন কুসুম, আমি ভুল করেছিলাম। আমি তোমাকে ভালবাসি।

মাধব সংবাদ

সুচেতার মধ্যে মাধবের গণ্ডগোলটা শুরু হয়েছিল বিয়ের দু'বছর বাদেই। বিয়ের দু-তিন বছরের মধ্যেই পৃথিবীর প্রায় সকলেরই এরকম একটু বিবাহিত জীবনের গোলমাল শুরু হয়। যখন পরস্পরের প্রকৃত রূপ দুজনে দেখতে পায়। তখন স্বভাবের পার্থক্যটা ধরা পড়তে থাকে, রুচি আর ব্যক্তিত্বের যুদ্ধ শুরু হয়। কিছুদিন এরকম চলে। আর তারপরেই পুরুষ হয় স্ত্রৈন হয়ে যায়, নয়তো নিস্পৃহ। নারীরা বাঘিনী বা গৃহিনী হতে থাকে। তারপর হয়তো বা কারো কারো জীবনে সেই দুর্লভ ব্যাপারটা জন্মায়, যাকে দাম্পত্য প্রেম বলে।

কিন্তু মাধব দাম্পত্য প্রেম ব্যাপারটাকে মোটেই বিশ্বাস করতে পারে না। দাম্পত্যই যদি তবে প্রেমটা আসে কোত্থেকে? প্রেমের মধ্যে যে একটু ঘোমটা টানা রহস্য, একটু আধো ছোঁয়ার রোমাঞ্চ, তা রোজ পরস্পরের কাছে ন্যাংটো হওয়া দু'টি নরনারীর মধ্যে কিভাবে সম্ভব। একটি ছোট বাসায় যখন রোজই দুজনে অল্প দূরত্বে বাস করছে, গায়ে গা ঠেকছে, অবিরাম পরস্পরকে চোখে পড়ছে, এবং দুজনের মধ্যে যখন কোন কথা বলাই আর বাকি থাকেনি, তখন রোমাঞ্চ বা রহস্য জন্মায় কি করে?

উপরন্তু সুচেতার জন্য দোষ না থাকুক, সে বড় রগচটা। খুব সহজেই, অতি সামান্য কারণে সে রেগে যায়। রেগে গেলে মাধবকে এমন কোন কথা নেই যা বলে অপমান করে না। আবার রাগ পড়লে আদরও করে খুব। কিন্তু রাগ তো একদিনের নয়। কাজেই আদরের পরও আবার মাধব অপেক্ষায়, আশঙ্কায় থাকে, কখন আবার সুচেতার রাগ হবে, কিসে হবে। কোন ঠিক নেই কিসে রাগ হবে সুচেতার। কখনো ঝিয়ের উপর রেগে গিয়েও মাধবকেই বকে সে। আর এই বকতে বকতে মাধব সম্পর্কে সমস্ত খারাপ কথাই তার বলা হয়ে গেছে। মাধবও যে চুপ করে থাকে এমন নয়। সুচেতা সম্পর্কে যত খারাপ কথা বলা যায় সবই রাগের মাথায় তার বলা হয়ে গেছে।

বিয়ের আট ন' বছর বাদে আজ মাধব বুঝতে পারে, অতি সুন্দরী

ঐ যে সুচেতা, ওকে আর সে ভালবাসে না, একটুও না। সুচেতা রাস্তায় বেরোলে এখনো কত পুরুষ আনচান করে, কত গোপন কামুক দৃষ্টি তাকে লেহন করে যায়, মাধবের দুই একজন বন্ধু যে হ্যাংলার মত সুচেতার দিকে চেয়ে থাকে এ সবই প্রমাণ করে যে সুচেতার মেয়েমানুষী ব্যাপারটা প্রবল। কিন্তু হায়, তার প্রতি আর কোন লোভ অন্তত মাধবের নেই। এমন কি তারা একনাগাড়ে বহুদিন সহবাস না করে পাশাপাশি শুয়ে থাকে। একটা চুম্বনেরও আদান-প্রদান হয় না। যখন ঝগড়া নেই তখনো নয়।

সুচেতা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, এমন নয়। বরং শারীরিক মিলনে মাঝে মাঝে সুচেতাই আগ্রহ দেখাতো, উত্তেজিত করে তুলত মাধবকে। কিন্তু বড় সহজেই সুচেতা অপমান করে একেবারে শীতলও করে দেয় তাকে। অর্থাৎ সুচেতা মাধবকে দরকার মত ব্যবহার করে মাত্র, মূল্য দেয় না। তবে সে একথা প্রায়ই বলে—তোমাকে আমি যে কত ভালবাসি তা তো বোঝ না।

এ রকম কথার বেলুন কিছুক্ষণ হাওয়ায় ভাসে। তারপর নিজের থেকেই ফেটে যায়।

কিন্তু মাধবের দেশজোড়া খ্যাতি এই অল্প বয়েসেই। সাঁইত্রিশ পেরোতে না পেরোতেই মাধব যাকে বলে রিনাউণ্ড আর্টিস্ট। আর্ট স্কুল থেকে পাশ করে সে প্রথমে কমার্শিয়াল কাজ শুরু করে। তার মৌলিক শিক্ষাটা ছিল খুবই ভাল, সে চমৎকার ড্রইং জানে, কম্পোজিশন জানে, রঙের রসবোধ চমৎকার। সে যেমন পারে সিনেমা হলের ইনটিরিয়র ডেকরেশন, তেমনি হাত তার শাড়ি বা ছিট কাপড়ের ডিজাইনে। পাবলিসিটির নানা কাজে সে সিদ্ধহস্ত ছিল। তাই সদ্য পাশ করে বেরিয়ে সে প্রথম কিছুদিন অর্থকষ্ট আর হাড়ভাঙা খাটুনির ধকল সইলেও ক্রমশঃ মস্ত মস্ত কাজ পেতে থাকে। আবার নিজস্ব আঁকার স্বভাব ছাড়েনি বলে তার ব্যক্তিগত সিরিয়াস ছবিগুলিও ক্রমে স্পষ্টভাষ হয়ে উঠছিল তাদের অন্তর্গত দার্শনিকতায়। তার কয়েকটা একজিবিশন প্রথমে পাত্তা পায়নি। এখন তার একজিবিশন একটা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হয়ে দাঁড়ায় কলকাতায়। প্রচুর ছবি বিক্রি হয়। ত্রিশ পেরিয়েই মাধব দাস দেশে নাম-করা ব্যক্তিত্বদের একজন। একবার বছর খানেকের জন্যে ইউরোপে ঘুরে এসেছে। সাঁইত্রিশেই সে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত।

সুচেতা জানে, তার স্বামী নাম-করা লোক। এও জানে, মাধবের ছবি আঁকা থেকেই সংসারের আয়ব্যয়। কোন অভাবই রাখে না মাধব। দেদার খরচ করে, তবে মাধব মদ খেলেও, কখনো মাত্রা ছাড়ায় না। তার ফুর্তির জায়গা বেশি নয়। মেয়েমানুষের দোষ মোটেই নেই, বরং মেয়েদের বেশ লজ্জাই পায় সে। নেশা বলতে সিগারেট, একটু বেশি খায়। জামা-কাপড়ের শৌখিনতা নেই, সিনেমা থিয়েটার খুব অল্প দেখে। মাঝে মাঝে বাইরে যাওয়ার নেশা আছে। আর ফোটোগ্রাফির শখ, তা ফোটোগ্রাফি সব আঁকিয়েরই খানিকটা জানতে হয়। তবে এসব ছাড়া, আর ট্যাক্সিতে চড়ার অভ্যাস ছাড়া তার আর খরচ কি? যা যায় সংসারের জন্যই যায়। সুচেতা ভাবে, মাধব বড় খরচ করে। সুচেতা ঝগড়া করে বলে—সংসার খরচের টাকা আমার হাতে দাও না বলেই অত খরচ তোমার। তা ও দিয়ে দেখেছে মাধব। টাকা হাতে পেলেই সুচেতা সংসার খরচ করতে গিয়ে নানা বাজে ব্যাপারে টাকা নষ্ট করে আসে। শাড়ি কিনল, রাজ্যের ঝুটো গয়না, ফুলের টব কিনে আনল। ফলে আর তার হাতে টাকা থাকে না। সাতদিনে সাতশো টাকা উড়িয়ে দেয় মন্ত্রবলে, তাই আর তার হাতে সংসার খরচের টাকা দেয় না মাধব। সেটাও হয়তো আর একটা রাগের কারণ।

সে যা-ই হোক, মাধব বিয়ের এই আট বছর বাদে সত্যটা বোঝে। অনেক মান-অভিমান, রাগ ও অনুরাগের পর, অবশেষে নিস্পৃহতা। মাধব তার বাইরের ঘরটায় স্টুডিও করেছে। আর একটা স্টুডিও আছে এসপ্ল্যানেডের কাছে। সারাদিন প্রায় সেখানেই কাটে। কিন্তু এখনও নিজের বাইরের ঘরে কাজ করে সে। সুচেতার বড় ভুলো মন। সকালে চায়ের পর জলখাবারটা সময়মত কোনদিন দিতে পারে না। সকালটায় একটা চমৎকার প্রাকৃতিক আলো আসে বলে সে সময়টায় বিভোর হয়ে কাজ করে মাধব। তখন কেউ যদি নেপথ্যে থেকে তাকে বিনা ঝামেলায় কিছু খাইয়ে না দেয় তো সে খাওয়ার কথা ভুলেই থাকে। চনচনে খিদে পেলেও গ্রাহ্য করে না। কিন্তু তার ফলে এক সময়ে শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ে। তখন সে হতাশ হয়ে ভাবে, হায়, আমার কি কেউ নেই? সুচেতা তো এক গ্লাস দুধও দিতে পারত। অথচ তাদের সাত বছরের ছেলেটাকে খাওয়ানোর জন্যে সুচেতা সারাটা দিন কত ধমকায়, মারে, বকে, কত আদরের সঙ্গে উদ্বেগের

সঙ্গে খাওয়ায়। ছেলেকে হিংসে করে না মাধব। কিন্তু মন বলে, ঐ ছেলেটার মত আমারও তো পাওনা। এ নিয়ে বনেক বলেছে মাধব, কাজ হয় না। সুচেতা কেবলই ভুলে যায়। কিংবা বলে, আমারও সকালে খিদে পায়।

মাধব বলে, খেলেই পারো, খাওয়ার চার্জ তো তোমার। খাওয়া এবং খাওয়ানোর।

সুচেতা উত্তর দেয়, আহা, কোন্ সন্দেশ রসগোল্লা আনো যে খাব।

এ হচ্ছে ঝগড়ার গন্ধ মাখানো কথা।

আজকাল মাধব বলে না কিছু। শুধু বুঝে যায়। তার মত কাজ-পাগল লোকের জন্যে একজন বিশ্বস্ত মানুষ দরকার। যে মানুষ তাকে দুই সতর্ক চোখে আগলে রাখবে। নিজেকে লুকিয়ে রেখেও যে মাধবকে ঘিরে রাখবে নানা অসতর্ক মুহূর্তে। যখন তীরবেগে ছবি আঁকে মাধব, তখন তার শরীর দ্বিগুণ ক্ষয় হয়। মাথায় চিন্তার পোকারা কুরে কুরে খায়। সিগারেটের ধোঁয়ায় ঝাঁঝরা হয়ে যায় বুক, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার সমস্ত ইন্দ্রিয় ছবির ভিতরে প্রাণসঞ্চার করতে গিয়ে শরীরের প্রাণকে নিংড়ে নেয়। সেই সময়ে মাধব শিশুর মত হয়ে যায়। কখনো হয়তো চিৎকার করে বলে কফি! সে ডাক সুচেতা কখনো শোনে, কখনো উপেক্ষা করে। কফি খেয়েছে কিনা তা অবশ্য মনে করতে পারে না মাধব। তবে বুকটা যেন শুকনো লাগে।

রবিবারে মাধবের ঘরে কিছু লোকজন আসে। কিছু বন্ধু, কিছু ছবির সমঝদার, কিছু ক্রেতা, কিংবা প্রশংসাকারী। আড্ডা মাধবের খুব প্রিয়। এসব অতিথিদের কখনো কখনো এক কাপ করে অন্তত চা খাওয়াতে তার ইচ্ছে হয়। কিন্তু পারে না, চা করার নাম করলেই সুচেতা ভয়ঙ্কর রেগে যায়। সোজা বলে দেয়, আমি পারব না, দিনরাত তোমার সংসারে গতর ক্ষয় করছি, আর কত চাও? আমার বিশ্রাম নেই? সাধ আহ্লাদ নেই?

মাধব খুবই অসহায় বোধ করে। ভাবে, সত্যিই বুঝি সুচেতাকে খুব খাটতে হয়। এরপর আবার ফরমায়েশী চা! থাক গে, বরং অতিথিদের কাছে অভদ্রতা হোক, তবু সুচেতাকে অত খাটানো ঠিক নয়। আবার কখনো ভাবে, সুচেতার খাটুনিটাই বা কি? এক বেলা রান্না করে দু'বেলা খাওয়া। রান্না ছাড়া আর বড় কাজও তো কিছু

নেই। ছেলেকে ইস্কুলের বাসে তুলে দিয়ে এসে সুচেতা হারমনিয়াম নিয়ে বসে, বা টুকটাক নিজের কাজ করে। শুয়ে বসে থাকে।

এ সব ব্যাপার নিয়েও অনেক কথা কাটাকাটি হয়েছে তাদের। হাতাহাতিও যে হয়নি এমন নয়। কোন লাভ হয়নি। বিয়ের আট বছর বাদে তারা নিতান্তই শরীরের দিক থেকে নিকটবর্তী মানুষ। তাদের মন সম্পূর্ণ ভিন্ন পথের যাত্রী।

এই যে মাধবের আঁকা সব ছবি, যার জোরে মাধবের এত নাম তার সম্পর্কেই বা সুচেতার মনোভাব কি? ঠিক বুঝতে পারে না মাধব। তবে এটুকু জানে যে, সুচেতা তার ছবির গুণমুগ্ধ ভক্ত নয়। বরং তার ছবি সম্পর্কে সে খুবই উদাসীন, তার খ্যাতি সম্পর্কেও। কখনো ছবি আঁকার ব্যাপারটা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে বলে, যেমন তেমন রঙ মাখিয়ে, ভুতুড়ে সব আবোল-তাবোল এঁকে লোক ঠকাচ্ছ। ও ছবি বাচ্চারাও আঁকতে পারে।

শুনে মাধব নিভে যায়। বুকটা কেমন করে ওঠে। নিজের ওপর আবার সন্দেহ আসতে থাকে, যা আঁকলাম, তার সবটাই কি তবে আবোল তাবোল? এই কূট সন্দেহ তাকে কষ্ট দেয়। সে ছটফট করে। আঁকতে বসে সে আত্মপ্রত্যয়ের অভাব বোধ করে। কোন কাগজে বা কোথাও কেউ মাধবের খুব প্রশংসা করলে, মাধব যদি সেটা সুচেতাকে শোনায়, তবে সুচেতা নিষ্ঠুর মৃদু হাসি হেসে বলে, তোমার খুব অহংকার হয়েছে। এত অহংকার ভাল নয়। হতে পারে মাধব কিছু অহংকারী। কিন্তু সে অহংকারের মধ্যে ছেলেমানুষী গুমোরটাই বড়। যখন কাজ করে মাধব, তখন সে সম্পূর্ণ অহংলুপ্ত, অবচেতনায় চলে যায়। তাই তার অহংকার কাউকেই আঘাত করার মত নয়। এবং সে নিজের ছবি সম্পর্কে সদাই খুঁতখুঁতে, সন্দিহান, সংশয়ী। একটা ছবির কাজ শেষ হলে সেটা কেমন হল তা বিচার করার ক্ষমতা পর্যন্ত তার থাকে না। সে বিড়বিড় করে ছবির দিকে চেয়ে কেবল বলে, খারাপ, খারাপ, খুব খারাপ। এত খারাপ কাজ জীবনে করিনি।

পরে হয়তো সেই ছবিটাই ভীষণ প্রশংসা পায়। পাঁচ-ছ হাজার টাকায় বিক্রি হয়ে যায়। তখন আবার মাধব ভাবে, ছবিটা দারুণ এঁকেছিলাম কিন্তু। তার অহংকারের রকমটা হল এই। যাদের সঙ্গে মেশে মাধব, যারা মাধবকে বহুকাল ধরে চেনে, তারা বলে, মাধবের অত নামডাক, তবু ওর মত এমন নিরহংকার মানুষ হয় না। একমাত্র

সুচেতাই ঠিক উল্টোটা বলে।

তার সাত বছরের ছেলের সঙ্গেও আজকাল মাধবের তেমন ভাব নেই। যখন ছেলে ছোট ছিল তখন সে ছেলের সঙ্গে খুব নেটিপেটি ছিল, ছেলে ছাড়া বাড়িতে এক মুহূর্ত থাকতে পারত না। এখন মাধবের কাজ বেড়েছে, ছেলেও বড় হয়েছে, তাই তার ছেলের সঙ্গে তেমন সম্পর্ক নেই। ছেলেটা অবশ্য মায়ের ন্যাওটাই হয়েছে বেশী। একটু বেশী আদুরে, মোটাসোটা কম বুদ্ধিওলা ছেলেটা ড্রয়িং ক্লাশে জিরোও পায়। অর্থাৎ মাধবের কোন ছাপই তার ওপর পড়েনি। মাধব যেন বা এক আগন্তুক, বাইরের অনাত্মীয় পুরুষ। সংসারের খরচের জোগান দেওয়া ছাড়া আর কোন ভূমিকা নেই।

এক একদিন কাজ করতে করতে রাত নিশুত হয়ে যায়। পৃথিবী ঘুমঘোরে অচেতন, মাধব তখন অবচেতনার তলা থেকে, ভাবনার গভীরতা থেকে উঠে আসে। জাগে। যেরকম, যেভাবে আঁকতে চেয়েছিল ঠিক সেরকম আঁকা হয়েছে হয়তো, মনটা তাই তখন তৃপ্ত, দেহের সমস্ত স্নায়ুগুলি সজাগ। আর তখন হঠাৎ সেই আনন্দময় অনুভূতি থেকে একটা কামভাব জন্ম নেয়। তখন খুব ইচ্ছে করে একটা নারীর শরীর পেতে এবং সেই শরীরের আনাচে কানাচে দীপাবলীর মত জ্বালিয়ে দিতে শরীরের ভালবাসা। প্রিয় একজন নারীকে গভীর ভাবে উপভোগ করার দুর্দম ইচ্ছা বাঘের মত হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। বাতি জেলে সে তখন শোওয়ার ঘরে এসে দেখে, অপরূপ রূপবতী সুচেতা গভীর ঘুমে চিত্রার্পিত হয়ে আছে। এই সময় যখনই সে সুচেতাকে জাগিয়ে প্রস্তাব রেখেছে তখনই সুচেতা চূড়ান্ত অপমান করে ঠান্ডা গলায় বলেছে, আমার কাম মরে গেছে, শরীরেও সয় না এত খাটাখাটুনির পর, তবু তোমার যদি ইচ্ছে করে যা খুশি কর। তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিও, আমার খুব ঘুম পাচ্ছে—

কিন্তু তাই কি হয়? স্ত্রীর কাছে দেহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলেই বুঝি পুরুষের বেশী লজ্জা। তাই মাধবেরও শরীর নীভে যায়। আর ঐ লজ্জা থেকে তার প্রচণ্ড রাগ হয়। কিন্তু তবু কিছু করার নেই বলে শুয়ে থাকে, ঘুম আসে না, চেপে রাখা রাগ তার স্নায়ু মস্তিষ্ক আর জীবনী শক্তির ভিতরে তাপ হয়ে ক্ষয় করতে থাকে সবকিছু। সত্য বটে, বিয়ের পর কিছুদিন সে সুচেতার প্রবল কামেচ্ছাকে তৃপ্ত করতে পারত না। আনাড়ী ছিল, তার ওপর

চিন্তাশীল বলে তার দেহবোধ কিছু কম, তারই প্রতিশোধ বুঝি সুচেতা আজকাল নেয়।

মাধব আজকাল পরিষ্কার বুঝতে পারে সে এক অবিবাহিত জীবনই যাপন করছে। ঘরে একজন মহিলা বাস করেন মাত্র। অর্থ বা যশের পরই পুরুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন মেয়েমানুষ। শুধু শরীর নয়, বরং তাকে অবিভাজ্য নারীসত্তাও বলা যেতে পারে। যাকে না হলে পুরুষের সম্পূর্ণতা আসতেই চায় না। বিয়ের পর মাধব কিছু ন্যুড এঁকেছিল সুচেতার। সেগুলো এখন কোন কোন অচেনা ক্রেতার ঘরে শোভা পাচ্ছে। তার কোন ছবি তো পড়ে থাকে না। আজ বহুকাল আর সুচেতার কোন ছবি আঁকে না। বছরখানেক আগে একটা ফরমায়েসী ছবি আঁকতে গিয়ে একজন মডেলকে ভাড়া করেছিল মাধব। তার নগ্ন শরীরের ভঙ্গী দেখে দেখে ছবি আঁকতে গিয়ে, যা শিল্পীদের কখনো হয় না, বা হওয়াটা অস্বাভাবিক, তা হয়েছিল তার। যে তার হাতের রঙ মুছে মেয়েটাকে বলল, আমার বড় কাম। আমি পারছি না। এত করুণ এই অসহায় ভাবে বলেছিল যে মেয়েটা হাই তুলে বলে, মাধববাবু, আমি টাকার জন্য সব করি।

তো তাই হল। মাধব তার এসপ্ল্যানেডের কাছে নির্জন এবং নিশ্চুপ স্টুডিওয় মেয়েটিকে উপভোগ করেছিল, টাকার বিনিময়ে। সারাক্ষণে তার মনের মধ্যে টাকা কথাটা কাঁটার মত বিঁধে ছিল বলে একটুও তৃপ্ত হয়নি। বরং ক্লান্ত হয়েছিল। তারপর থেকে মাধবের আর ও রকম পদস্খলন হয়নি। সে বুঝে গেছে, তার একজন মেয়েমানুষ দরকার। নিজস্ব নারী, শরীর নয়।

কেবলমাত্র রাত্রে ছাড়া নিজের ঘরের স্টুডিওয় আর কাজ করে না মাধব। সারাদিন সে তার এসপ্ল্যানেডের স্টুডিওয় পড়ে থাকে আজকাল। এখানে টেলিফোন আছে, বিশ্রামের জন্য খাট বিছানা আছে, সোফা বা কৌচ আছে। প্রচুর বইপত্র, বুকলেট, নানা যন্ত্রপাতি বা ক্যামেরা সব ছড়িয়ে থাকে এধারে ওধারে।

গতকাল রাত্রে মাধব বাড়ি ফেরেনি, স্টুডিওয় ছিল। আগে আগে বাড়ি না ফিরলে সুচেতা খোঁজ করত টেলিফোনে। কাল তাও করেনি। খোঁজের দরকারও নেই। জানে স্টুডিওয় আছে। কিংবা অন্য কোথাও।

এক কাপ কড়া কফি তৈরি করে নিয়ে মাধব সোফায় বসে আছে। মাঝরাতে ঘুমিয়েছিল, বেলা আটটায় উঠেছে। চোখে জ্বালা, মাথাটা পরিষ্কার নেই, শুধু মনটায় একধরণের অদ্ভুত আনন্দ। একটা বিচিত্র পেইণ্টিং প্রায় শেষ হয়ে এল। অনেক গুলো মাথা একটা নীল অন্ধকারে ভাসছে, মাঝখানে একটা হাল্কা কাঠ-কয়লা কালো রঙের কুয়াশা। ছবির নীচে কতকগুলো নৃত্যরত পায়ের ইঙ্গিত। ছবিটায় একটা ভীষণ গতি রয়েছে। ওপর দিককার শূন্য জায়গাটা ভরাট করার জন্যে একটা রঙের মিশ্রণ কাল রাত থেকে ভাবছে। অল্প দুধ মেশানো এই কফির রঙটা তার খুব পছন্দ হচ্ছিল। এই রঙ দিয়ে একটা পটভূমি হবে, তার মধ্যে চাঁদের গায়ে যেমন এবড়ো-খেবড়ো দেখা যায় ক্লোজআপ-এ তেমনি একটা কাজ করবে। ছবিটা সম্পূর্ণ হলে কেমন হবে কে জানে! কিন্তু কাজটা করতে একটা তীব্র উত্তেজনা বোধ করছিল সে। গরম কফিটা শেষ করছিল তাড়াতাড়ি।

দরজাটা খোলাই আছে। একটু আগে বাড়ির দারোয়ানের বৌ এসে ঘর ঝাঁট দিয়ে গেছে, রোজ যেমন দেয়। তারপর আর বন্ধ করা হয়নি। দরজায় কে যেন টোকা দিচ্ছে।

ঈষৎ বিরক্ত মাধব বলে, আসুন।

বলেও তাকায় না। কত কে আসে। আজকাল ভিজিটারের শেষ নেই।

ছলচাতুরীহীন একটি মেয়ে ঘরে এল কুণ্ঠাভরে। বয়স কুড়ির কাছাকাছি। সাদামাটা শাড়ি পরা, মুখটি লাবণ্যময়। শরীর রোগার দিকে। রঙ একটু চাপা এবং স্নিগ্ধ। বেশ মেয়েটি, এক নজরেই পছন্দ করা যায়।

কাকে খুঁজছেন? মাধব অবাক না হয়ে জিজ্ঞেস করে।

আপনার কাছেই এসেছি। মা জিজ্ঞেস করতে পাঠাল, আপনি কি সকালবেলায় কিছু খান না?

এবার একটু অবাক হয় মাধব। বলে, কে মা?

মেয়েটি লজ্জাভরে বলে, আমরা এ বাড়িতেই থাকি। ওপাশে। বলে হাত তুলে দেখাল একটা দিক। মাধব বোঝে, মুখোমুখি দরজায় ওপাশের ফ্ল্যাটে থাকে ওরা। অবশ্য মাধব কাউকে চেনে না, খোঁজও নেয় না।

মেয়েটা ফের বলে, আপনি মাঝে মাঝে এখানে এসে থাকেন দেখছি,

কিন্তু খাওয়া দাওয়া করেন বলে মনে হয় না। তাই মা বলে পাঠাল, আপত্তি না থাকলে আমরা কিছু খাবার করে পাঠাতে পারি।

মাধব প্রস্তাব শুনে হাসল। বিখ্যাত হওয়ার কতকগুলি পুরষ্কার আছেই। খুব সাধারণ নীচুতলার মানুষ হয়তো তার নাম জানে না, কিন্তু একটু উঁচু থাক-এর মানুষ জানে যে, মাধব পটুয়ার ছবি বিদেশেও বিক্রি হয়। বলতে গেলে সে আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী।

হেসে মাধব বলল, খিদে তো পায়। খাওয়া হয়ে ওঠে না বড় একটা। খিদে চেপে আমি বেশ কাজ করতে পারি।

সেটা কি ঠিক?

মাধব মাথা নেড়ে বলে, মোটেই না। আচ্ছা, তোমরা দিলে খাব।

মেয়েটা আন্তরিক খুশির মুখ করে চলে গেল। একটু বাদেই এল বিশাল প্লেটে বাটিতে নানারকম খাবার নিয়ে। মাধবের খুব খিদে ছিল, কফি দিয়ে সে খিদেটা সে চেপে রাখে প্রায়ই। বিনা আপত্তিতে ডিম দিয়ে টোস্ট খেতে খেতে সে বলে, আপনি আমাকে চেনেন?

মেয়েটি মৃদু হেসে বলে, খুব। আপনার ছবি দেখেছি। আর দুটো সিনেমায় আপনি আর্ট ডিরেক্টর ছিলেন, তাও জানি। আমাকে 'তুমি' করে বলবেন।

একটা শ্বাস ফেলল মাধব। নিয়তি। অত্যন্ত ভাবানুভূতির স্পর্শকাতর রাজ্যে বাস করে বলেই সে কতগুলো জিনিস আগে থাকতেই টের পায়। যেমন এই ক্ষণেই সে টের পেল, এই মেয়েটি তার জীবনে ঢুকে গেল চিরদিনের মতো. সুচেতা অন্যমনস্ক না থাকলে এমনটা হত না। সুচেতার জন্যই হল।

মেয়েটির দিকে মনোযোগ দিয়ে একটু চেয়ে থেকে মাধব বলে, শোন, আমি বড় একা, ভীষণ। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হলে চলে এস। তোমাকে ছবি বোঝাব।

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে বলে, আমি আর্ট কলেজে পড়ি।

সে কি!

মেয়েটি মৃদু হেসে মাথা নত করে বলে, আমার নাম পৃথা। পৃথা রায়।

মেয়েটি চলে যায় "আসি" বলে।

আবার এল পরদিন। বলল, ছবি পরে বুঝব। আর ছবি তো নিজেকেই বুঝে নিতে হয়। আমি একটু আপনাকে বুঝতে চাই।

মাধব বলে, কেন ?

আপনি যে বলেছিলেন একা। সেইটে কেন ? আমিও কখনো কখনো ভীষণ একা বোধ করি, বুঝতে পারি না কেন !

মাধবের ছবিটা এখনও শেষ হয়নি। ঐ যে অল্প দুধমেশানো কফি রঙ—সেইটে কিছুতেই হচ্ছে না। তিন চারবার মিক্স তৈরী করল। বেস-টা হয়ে গেলে চাঁদের মাটির রুক্ষ ধূসর গহ্বরগুলি, ঢেউগুলি তার ওপর চমৎকার মানাবে।

শোন পৃথা, আমার কাছে এস মাঝে মাঝে। নিজেই বুঝে নিও, কেন একা। ওসব কি বোঝানো যায় ?

পৃথা হেসে লাজুক ভঙ্গীতে মাথা নোয়াল। ভঙ্গীটা দেখে বুকটা স্নিগ্ধতায় ভরে গেল মাধবের।

পঞ্চমদিন মাধবের ছবিটা শেষ হয়েছে। মাঝখানে কয়েকদিন ঘুরে আসতে হল সিনেমার আউটডোর শুটিংয়ে। ফিরে এসে ছবিটা ধরতেই শেষ হয়ে গেল। বড্ড বেশী পরিশ্রম গেছে ছবিটার পিছনে। কি হল, ঠিক বুঝতে পারছে না মাধব। নীল অন্ধকারের কয়েকটা উত্তেজিত মাথা বা মুখের অসহায় সংশয়, কাঠকয়লা রঙের কুয়াশার নীচে নৃত্যরত পা-গুলি, ওপরে কফির রঙের ওপর চাঁদের ক্লোজ-আপ বুক।

খাবার নিয়ে পৃথা এল সকালে, এখন মাধব কফি খাচ্ছে। মুখটা শুকনো, ক'দিন দাড়ি কামায়নি, ঘুম হয়নি। মনটা ভয়ঙ্কর— অস্থির আর সন্দেহে ভরা। ছবিটা শেষ হয়েছে বটে, কিন্তু কেমন হয়েছে ?

পৃথাকে সে জানালার পাশে দাঁড় করিয়ে বলল, দেখ তো কেমন লাগছে ? বলে একটু অপেক্ষা করেই বলে, একদম ভাল হয়নি, না ?

পৃথা খুব মন দিয়ে দেখল। বলল, আপনি যা আঁকেন সবই ছবি হয়।

ওসব হেঁয়ালী কথা নয় পৃথা। তুমি ঠিক ঠিক বল ছবিটা দেখে প্রথম রি-অ্যাকশন কি, ফের বিকেলে এসে বোলো ছবিটা তোমাকে হন্ট করে কিনা। এরপরও ছবির স্মৃতি শেষ হয় না। একটা ছবি যদি ভাল হয় তো তার এফেক্ট বহুদিন মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

পৃথা তার মুখের দিকে চেয়ে বলে, ঐ ছবিটা যেখান থেকে এসেছে আমি সেখানে যেতে চাই।

ও! মাধব হতাশার সুরে বলে, তুমি ছবিটা বুঝতে পারছ না পৃথা!

পৃথা মাথা নেড়ে হেসে বলল, বললাম তো, ছবিটা যেখান থেকে এসেছে আমি সেইখানে যেতে যাই।

মাধবের ধন্দ লাগে, বলে, সে কোথায় পৃথা?

কি করে বলব? আমি শুধু যেতে চাই।

মাধব বুঝল। হঠাৎ একটা হাতে সে পৃথাকে টেনে আনল বুকের কাছটিতে। শরীরে সেই তীব্র কামবোধ। উদ্যত ঠোঁটে ভয়ঙ্কর তৃষ্ণা।

পৃথা মাথা নেড়ে বলে, ওভাবে কি যাওয়া যায়?

তবে?

পৃথা তার মাথাটা দু-হাতে ধরে গভীর চোখে চোখের দিকে তাকাল। যেমন মনস্তত্ত্ববিদ তার রোগীর দিকে তাকায়। তারপর ধীর স্বরে বলে, ঐ যে চোখ দেখে, ওর পিছনে যে ভীষণ বুদ্ধি আর অদ্ভুত মন —ওখানে কে যেতে পারে? ওখানে যাওয়ার কি রাস্তা আছে। শরীর দিয়ে তো হয় না।

তবে কি দিয়ে হবে? আকুল জিজ্ঞাসা করে মাধব।

তীর্থযাত্রীর মত যেতে হয়। খুব বৈরাগ্য লাগে, অনেক ত্যাগ।

টেলিফোন বাজছিল, মাধবের মাথা তখনো ধরে রেখেছে পৃথা, সেই অবস্থাতেই মাধব টেলিফোন কানে তুলল। সুচেতা ভীষণ বিরক্ত গলায় বলে, তুমি কি জানোয়ার? আমার হাতে একটাও টাকা দিয়ে যাওনি, চলবে কিসে?

আচ্ছা, যাচ্ছি।

পৃথা দাঁড়িয়ে ছিল। মুখে একটু হাসি।

মাধব তার দিকে চেয়ে রইল। আর চেয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ দু'চোখ ভরে জল এল তার।

পৃথিবীতে মাধবের সত্যিই কেউ নেই।

কথোপকথন

তোমার নাম মথুরা ? বল কী হে ! মেয়েদের তো আমি এমন নাম শুনিনি।

না তো, আমার নাম মধুরা।

মধুরা ! ওঃ হো। দেন ইট ইজ এ ভেরি আধুনিক নেম। মথুরা ভেবে আমি একটু চমকে গিয়েছিলুম। আমাদের স্কুলের অঙ্কের মাস্টারমশাই ছিলেন মথুরানাথ। এ প্রডিজি ইন অঙ্ক। হেঃ হেঃ। বাঃ, এই ঘরটা তাহলে এয়ারকন্ডিশান্ড।

এ ঘরটায় একটা পোর্টেবল কুলার আছে। ওই যে আপনার পিছনে।

ওঃ ওটা ! আমি ভেবেছিলাম কোন কিম্ভূত যন্ত্র বুঝি। তোমার বাবা বিশাখ তো একটু ছিটগ্রস্ত। তা এরকম কুলার তো কখনো দেখিনি। বেশ জিনিস। তোমাদের কুকুরটা বাঁধা আছে তো ! কুকুর আই ক্যান্ট টলারেট।

আছে। কেউ এলেই বাঁধা হয়। তবে ছাড়া থাকলেও কামড়ায় না।

ওটা সব কুকুরওলাই বলে। ভয় নেই, আমাদের কুকুর কামড়ায় না। কিন্তু আই ডোন্ট বিলিভ। সেই যে শরৎচন্দ্রের কী একটা কথা আছে না, যে মদ খায় অথচ মাতাল হয় না সে হয় মিছে কথা বলে না হয় মদের বদলে জল খায়। কুকুরের বেলাতেও তাই। কুকুর পুষেছ অথচ সে কখনো কামড়ায়নি একি হতে পারে ? হয় তুমি বাজে কথা বলছ, না হলে ন্যাকড়ার কুকুর পুষেছ।

আমাদের কুকুরের বয়স দশ, আজ অবধি একজনকেও কামড়ায়নি।

তোমার বয়স কত ?

কুড়ি।

স্ট্রেঞ্জ ! তার মানে দশ বছর বয়স থেকে দেখছ কুকুরটাকে। কাউকে কামড়ায়নি ? নেভার ?

না।

তোমার বাইশ ?

না তো, বললাম না কুড়ি ?

রাইপ এজ, রাইপ এজ। ভোট দাও ?

গতবার বয়স হয়নি, এবার দেব।

কাকে দেবে ?

দেখি। ঠিক করিনি এখনো।

বিনয়কে দিও। বিনয় দত্ত। ভাল ছেলে।

চেনো নাকি ?

কেন, তুমি চেনো না ? হি ইজ এ ফেমাস ফেলো।

চিনব না কেন। চিনি, তবে আলাপ নেই।

আলাপ করিয়ে দেবোখন, পলিটিক্সওয়ালাদের সঙ্গে ভাবসাব রাখা ভাল। বিশাখটা আবার একটু হেডস্ট্রং গোছের। কাউকে পাত্তা দিতে চায় না।

মানুষজন সম্পর্কে বাবা একটু চুজি টাইপ।

সেটা দোষের নয়। বাট বিনয় দত্ত ইজ নট এ যে সে। অ্যাসেমব্লীতে মাঝে মাঝে ধুন্ধুমার লাগিয়ে দেয়। গেছ কখনো অ্যাসেমব্লীতে ?

না।

যেও। ওপরে গ্যালারি, নিচে এরেনা, দারুণ লড়াই চলে সেখানে। মাঝে মাঝে তো মনে হয় নট্ট কোম্পানির যাত্রার চেয়েও বেটার এণ্টারটেনমেণ্ট। তোমাদের কুকুরটা একটা ডাক ছাড়ল না ?

হ্যাঁ। বাগানে বোধ হয় ছাগল বা গরু ঢুকেছে।

আর ইউ সিওর যে, কুকুরটা বাঁধা আছে ?

নিশ্চয় ? নইলে এতক্ষণে এঘরে এসে তাণ্ডব করত।

শিকলটা ছিঁড়ে ফেলবে না তো ?

না, না, আপনার ভয় নেই।

ভয় আছেই, তোমাদের এখানে কি খুব চোরচোর আসে ?

এ বাড়ি কখনো আসেনি। বোধ হয় জিমির ভয়েই। তবে মাঝে মাঝে আশেপাশে চুরি হয় বলে শুনতে পাই।

চোর ইজ এ সামাজিক মিনেস। এই চুরি জিনিসটা যদি বন্ধ হয়ে যেত। এনি ওয়ে তোমার তাহলে কুড়ি চলছে। কুড়িতে সে আমলে মেয়েরা আর ছুঁড়ি থাকত না, বুড়ি হয়ে যেত। আজকাল সব কুড়িতেও কুঁড়ি, নবীনা, কিশোরী।

কুড়িতে বুড়ি হলে ঘাটে গিয়ে তারা কী হত ?

সূক্ষ্ম প্রশ্ন। আসলে কুড়িতে বুড়িয়ে গিয়ে বাকী জীবনটা, তারা জুড়িয়েই থাকত। কুড়ির পর জীবন থেমে যেত কিনা।

থেমে যেত, না থামিয়ে দেওয়া হত ?

খুব ভাল প্রশ্ন, ব্যাপারটা আসলে তাই। থামিয়ে দেওয়া হত। আজকাল অবশ্য মেয়েদেরই যুগ পড়েছে। তাদের থামায় কোন্ বাপের ব্যাটা ?

সেই জন্য নিশ্চয়ই পুরুষরা খুব মুষড়ে পড়েছে ?

ও বাবা, তুমি কি ওই কী বলে উইমেন্স লিবের সাপোর্টার নাকি ?

উইমেন্স লিব কি খুব অন্যায় কিছু ?

না, তা অবিশ্যি নয়, জিনিসটা খুবই ভাল। মায়ের জাত বলে কথা।

মায়ের জাত কথাটা শুনতে বেশ ভাল, কিন্তু আসলে দাসীর জাত।

হেঃ, হেঃ, কথাটা মন্দ বলনি। তা দেখ, তোমাদের ওই পোর্টেবল কুলারে আমার হচ্ছে না। ফ্যানটা চালিয়ে দেবে একটু ? আস্তে করে।

দিচ্ছি।

বাঃ, ওতেই হবে, একটু ঘামছি। হাই-প্রেশার তো।

এখানে খুব গরম পড়ে।

তাই তো দেখছি।

আরও পড়বে। এ তো সবে চৈত্রের শেষ। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠতে গা জ্বলে যায়।

আমি জানি। এই অঞ্চলে আমার ছেলেবেলা কেটেছে। মুকুন্দপুরে আমার মামার বাড়ি ছিল। ওখানেই মানুষ।

মুকুন্দপুর। ও বাবা, সে তো ডাকাতের জায়গা।

তখন ছিল না। মোটে তো বিশ-ত্রিশ ঘর লোকের বাস ছিল। একেবারে অজ পাড়া-গাঁ! ডাকাত কেন ছিঁচকে চোরও ছিল না। আজকাল গাঁ বড় হয়েছে, কিছু লোকের হাতে কাঁচা পয়সা এসেছে। এখন তো ওসব হবেই। বিশাখ এই গরমে কারখানায় কাজ করে কী করে বল তো ?

বাবার সব সয়ে গেছে। ফারনেসের ওই তাপ আমরা এক মিনিটও

সইতে পারি না। বাবা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চোখে রঙীন চশমা আর হাতে গ্লাভস পরে বসে থাকে।

বিশাখটা বরাবর খুব একরোখা ছিল। এখনও এই বয়সেও জেদ কমেনি, রোখ ঠিক আছে। তাই পারে। আমি বাহান্নতেই রক্তে চিনি এবং প্রেশার বাগিয়ে বসে আছি। বিশাখ অবশ্য ব্যায়াম করত। তোমার মা কি কলঘর থেকে বেরিয়েছেন ?

না তো! কেন, আপনি যাবেন ? কোনো অসুবিধে নেই, পাশের ঘরের সঙ্গে আর একটা বাথরুম আছে।

না না, আমার জন্য নয়। বউঠান বেরোলে একটু কথাটথা বলতাম আর কি।

মা'র বাথরুমে একটু সময় লাগে।

বড় বড় লোকদের বাথরুমই নাকি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক। ওখানে বসে বসেই নানারকম পলিসি ঠিক করেন। বাথরুম আর কাদের প্রিয় জান ?

কাদের ?

তোমার বয়সী কুমারী মেয়েদের। হেঃ হেঃ। কেন তা আবার জিজ্ঞেস করে ফেল না। জবাব দিতে পারব না, লজ্জা পেলে নাকি ?

না না, আমি এত লজ্জাবতী লতা নই। কিন্তু আপনার কথাটা ঠিক নয়।

কেন বল তো ?

আজকালকার মেয়েদের হাতে এত সময় থাকে না যে বাথরুমে বেশিক্ষণ কাটাবে। তাদের অনেকরকম কাজ থাকে।

কথাটা স্বীকার করতে বলছ! তুমি বললে মেনে নেব, কারণ আমি সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে তর্ক করতে ভালবাসি না।

আমি আবার সুন্দরী নাকি! মায়ের বন্ধুরা কী বলে জানেন ?

কী ব'লে ?

তারা মাকে বলে, কী গো রানী, তোমার মেয়ে তো একদম তোমার মত সুন্দরী হল না।

ওঃ, তোমার মায়ের কথা বলছ! কী আর বলব, তোমার মায়ের কথা উঠলেই আমি একটু প্রগলভ হয়ে পড়ি। তবে সেই বয়সে তোমার মায়ের যা রূপ ছিল তা অ্যানইম্যাজিনেবল। একবার কী হয়েছিল

জান! বিশ্বাস করবে না হয়তো, তোমার মায়ের মুখে একটা ভ্রমর—মানে একটা রিয়্যাল ভ্রমর—উড়ে উড়ে বসবার চেষ্টা করছিল। মনে হয় ভ্রমরটা তোমার মায়ের মুখখানাকে পদ্মফুল বলে ভুল করেছিল। তা ভুল হতেই পারে, ওরকম ভুল মানুষেরও হত।

যাঃ! ফ্ল্যাটারার কোথাকার!

হাসছ! বিশ্বাস করছ না? সে বয়সে তোমার মাকে যদি দেখতে তাহলে বুঝতে একটুও বাড়িয়ে বলছি না।

মা সুন্দরী ঠিকই, কিন্তু তা বলে—

সুন্দরী বললে কিছুই বলা হয় না। শী ইজ এ ড্রিম।

উঃ, অসহ্য।

কী হল?

পুরুষগুলো যা হ্যাংলা হয় না!

হ্যাংলা কি বলছ! তোমার মায়ের জন্য অন্ততঃ তিনজন পাগল হয়ে গেছে। দু'জন সুইসাইড করেছে। চারজন সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে চলে গেছে···

থামুন তো। মা মোটেই অত সুন্দরী নয়। আপনাদের বড্ড বাড়াবাড়ি।

বাড়াবাড়ি? তা হবে।

নিশ্চয়ই বাড়াবাড়ি।

হেঃ হেঃ। কথাটা কী জানো? বাড়াবাড়ি না করলে অর্থাৎ একটু ইমোশন্যাস একসেস না থাকলে, রিয়েলিটির ওপরে ড্রিমের একটা ল্যাকারিং না পড়লে জীবনটা বড্ড আলুনী হয়ে যায়। তোমাকে আজ একটা গোপন কথা বলি। শুনলে হয়তো হাসবে। ইন ফ্যাক্ট আমি তোমার মায়ের জন্যেই ব্যাচেলর রয়ে গেলাম।

ওটা আবার গোপন কথা নাকি? আমি তো জানি।

জানো? অ্যাঁ! কী করে জানলে?

বাঃ, আমাদের বাড়িতে প্রায়ই তো আপনাকে নিয়ে কথা হয়।

হয়? এখনো কথা হয়?

খুব হয়। মা তো বলে, সুধীরটা বড্ড বোকা, আমাকে বিয়ে করতে পারল না বলে কাউকেই বিয়ে করল না। এই বয়সেও হাত পুড়িয়ে নিজে রেঁধে খায়। বুড়ো বয়সে ওকে যে কে দেখবে!

বলে বুঝি? বাঃ, শুনে এত ভাল লাগছে?

এত ভালবাসা কি করে হয় বলুন তো! আমরা তো ভাবতেই পারি না।

তোমাদের যুগটা কিরকম জানো? এ লাভলেস এরা। প্রেমহীন সময়।

তাই বুঝি? আমার তো মনে হয় আমাদের যুগটা রিজনিং-এর যুগ, প্র্যাকটিক্যাল আউটলুকের যুগ।

তাও বলতে পারো। কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল আউটলুকটাও এক ধরনের নিষ্ঠুরতা।

আপনিও তো নিষ্ঠুর কম ছিলেন না। শুনেছি, আপনি বাবাকে খুন করার জন্য ছোরা নিয়ে ঘুরতেন।

এঃ হেঃ, এসবও তোমার কানে গেছে নাকি! ছিঃ ছিঃ! আসলে একটা এমন পাগলামিতে পেয়েছিল তখন যে বিশাখের মত বন্ধুকেও খুন করার কথা ভাবতাম। আমি তো কোন দিক দিয়েই ওর সমান ছিলাম না। ও ছিল ব্যায়ামবীর, বিশাল চেহারা। তার ওপর দারুণ ডাকাবুকো। রানীকে ও প্রায় হেলাফেলায় দখল করে নিল। আমি ছিলাম কাপুরুষ, দুর্বল, রোমাণ্টিক।

আপনাকে দেখলে তো সেরকম মনে হয় না!

কী মনে হয় তাহলে?

মনে হয় আপনিও খুব অ্যাট্রাকটিভ ছিলেন।

ইজ ইট এ কমপ্লিমেণ্ট?

কমপ্লিমেণ্ট, বাট নট ফ্ল্যাটারি।

আজ যে কার মুখ দেখে উঠেছিলুম।

কেন বলুন তো!

তোমার মত একজন তরুণী এবং সুন্দরীর কমপ্লিমেণ্ট পেলাম যে।

ফের সুন্দরী বলছেন?

কেন সুন্দরী বললে তোমার রাগ হয় নাকি?

আপনার মুখে শুনলে হয়, মায়ের রূপে আপনি তো অন্ধ। ওই চোখ দিয়ে আপনি কি আর কাউকে সুন্দরী দেখতে পারেন?

পারি। রানীর সৌন্দর্য ছিল ক্ল্যাসিক্যাল আর তুমি—

থাক, বলতে হবে না।

তাহলে থাক। আমার মত বয়স্ক একজন লোকের কমপ্লিমেণ্টে

তোমার কীই বা হবে।

মোটেই তা বলিনি।

বলার দরকার কী? বুঝতে অসুবিধে হয় না। তবে মেয়েদের একটা সুন্দর স্বভাব আছে। তারা সকলের কমপ্লিমেণ্টই নেয়।

আমার এত কমপ্লিমেণ্টের দরকার নেই। ওই যে আপনার ব্ল্যাক কফি এসে গেছে।

বাঃ! বিউটিফুল। তুমি রাঁধতে পারো?

ঠাৎ ওকথা কেন?

জীবনে আমার যে ক'টা বিলাসিতা' ছিল তার মধ্যে খাওয়া একটা। বুঝলে? আমি ভাল রান্নার খুব ভক্ত ছিলুম।

সে তো সবাই।

কিন্তু আমার কপালটার কথা ভাব। ভাল রান্না ভালবাসি, অথচ বউ জুটল না বলে সেদ্ধপোড়া খেয়ে আয়ুটা কেটে গেল।

বউ বুঝি শুধু রাঁধুনী? অত দুঃখ থাকলে একটা রান্নার লোক রেখে নিলেই পারেন।

বউ রাঁধুনীর চেয়ে অনেক বেশি কিছু। আর তাই সে শুধু তো রাঁধে না, রান্নার মধ্যে তার ভালবাসা থাকে, শুভ কামনা থাকে। মাইনে করা রাঁধুনি কি তা পারে?

আপনি একটা রোমাণ্টিক—

ইডিয়ট তো! ঠিকই বলেছ।

ভাগ্যিস মায়ের সঙ্গে আপনার বিয়ে হয়নি। তাহলে রাঁধিয়ে রাঁধিয়ে মেরে ফেলতেন।

হেঃ হেঃ! খুব ভাল বলেছ। তবে আমার ধারণা, রানী আমার বউ হলেও রান্নাঘরে আসীনা হত না। আমাকে বাধ্য করত রাঁধুনি রাখতে। যতদূর জানি তোমাদেরও রানী রান্না করে খাওয়ায় না। তাই না?

না। মা রাঁধতে জানেই না। রাঁধুনির অসুখ হলে আমরা হোটেলে গিয়ে খাই।

কী অভিশাপ!

অভিশাপ হবে কেন? এরকমই হওয়া উচিত।

তাই বুঝি তুমিও রাঁধতে শেখনি?

আমার কথা আলাদা।

কেন, আলাদা কেন ?

আমার এক পিসি একটা রান্নার বই লিখেছে। খুব কাটতি। সেই বইটা লেখার সময়ে আমি পিসিকে অ্যাসিস্ট করেছিলাম। অনেকগুলো রেসিপি শিখে যাই। মাঝে মাঝে সেগুলির ডেমনস্ট্রেশন দেওয়ার জন্য রাঁধি।

বাঁচা গেল। আমিও বলি রান্নাটা শুধু একটা কাজ নয়, একটা আর্টও। রান্নার ভিতর দিয়ে স্বামী-স্ত্রী এবং পরিবারের সকলের সঙ্গে সকলের একটা রিলেশনও গড়ে ওঠে।

বাজে কথা। আপনি এত সেকেলে কেন বলুন তো।

তোমার বয়ফ্রেন্ড নেই ? বা অ্যাডমায়ারার ?

আছে। কেন ?

এমনি। আজকাল একজন মেয়ের এক ঝাঁক করে বয়ফ্রেন্ড থাকে।

সেটা কী দোষের ?

না না তা বলিনি। রেগে যেও না। বলছিলাম আজকালকার মেয়েরা সেই বয়ফ্রেন্ডদের মধ্যে কাউকেই শেষ অবধি বিয়ে করে না। করে আর একজনকে।

ফ্রেন্ড ইজ ফ্রেন্ড, তাকে বিয়ে করার কি আছে ?

আমাদের আসলে এরকম ছিল না। তখন একটা মেয়ের সঙ্গে তিনবার চোখাচোখি হলেই ধরে নিতুম মেয়েটা আমার প্রেমে পড়ে গেছে। তোমাদের কুকুরটা খুব ডাকছে।

ভিখিরি এসেছে।

ভিখিরি দেখলে খুব চেঁচায় বুঝি ?

হ্যাঁ।

তাই আমাকে দেখেও চেঁচাচ্ছিল ওরকম।

আপনি কি ভিখিরি নাকি ?

একরকম তাই, কিছু চাইতে আসিনি অবিশ্যি কিন্তু এক বুক কাঙালপনা নিয়ে এসেছি যে। কুকুরটা ঠিক টের পেয়েছে, আমি ভিখিরি।

কিসের কাঙালপনা আপনারা ?

কি জানি, ঠিক বুঝতে পারি না।

আপনি কি মাকে দেখতে আসেন ?

না না, মোটেই তা নয়। রানীর প্রতি সেই টান তো আর নেই।

তাহলে?

ভাবতে দাও। দেখি যদি ভেবে পাই।

পাবেন না।

পাব না? কেন বলতো!

বসুন। আজ আপনাকে আমি নিজে একটা জিনিস রেঁধে খাওয়াব।

কী বল তো।

চীজ মশালা, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু রান্নার মধ্যে আরও কী কী মেশালে যেন রিলেশন তৈরী হয় বলছিলেন! সেইসব আজগুবি জিনিস মিশিয়ে দেব।

আমার বয়স কত জান মধুরা?

জানি, বাবার চেয়ে আপনি ছয় বছরের ছোট। অর্থাৎ আটচল্লিশ।

সেটা কি বেশি বয়স নয়?

তা আমি কি করে বলব? যে যেভাবে নেয়।

তোমার মা কিন্তু কলঘরে বড্ড বেশি দেরি করছে।

করুক। মাকে তো আপনার দরকার নেই আর। আছে নাকি?

না, না। আমি বসছি। তুমি রাঁধো।

বিশ বছর আগে

শচীন রায় স্যার মারা গেছেন। ইস্কুল ছুটি হয়ে গেল। প্রথমে ছেলেরা এসে দাঁড়াল স্কুলের উঠোনে সারিবদ্ধ হয়ে। দু'মিনিট নীরবতা। সেই নীরবতার মধ্যেই অধীরকে একটা চিমটি কেটে শঙ্কর বলল, ড্রিল স্যারের কাছ থেকে ফুটবলটা চেয়ে নেব।

দেবে না, অধীর বলে।

না দিলে রবারের বল আছে।

শচীন স্যারের বাড়িতে সবাইকে যেতে হবে, নোটিশ শুনলি না।

দু'মিনিটের পর হেড মাস্টারমশাই গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, ছেলেরা, তোমরা সবাই জানো, শচীনবাবু আর নেই। আমাদের সকলের প্রিয় সহকর্মী, তোমাদের প্রিয় মাস্টারমশাই আজ সকালে হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছেন, বয়স হয়েছিল মাত্র পঞ্চাশ বছর, মরবার বয়স নয়, তাঁর আগেই অকাল মৃত্যুতে আমাদের শোক প্রকাশের ভাষা নেই। তোমরা সবাই লাইন করে দাঁড়াও। ড্রিলের মাস্টার মশাই সন্তোষবাবু তোমাদের নিয়ে যাবেন। তোমরা শচীনবাবুর মৃতদেহে দূর থেকে তোমাদের প্রণাম জানাবে, কেউ তাঁর দেহ ছোঁবে না। শুধু ইস্কুল মনিটর মানব সিংহ একটি ফুলের তোড়া তাঁর শয্যায় রেখে আসবে। আমরাও সবাই যাব। কেউ কোন গোলমাল করবে না হাসবে না, কথা বলবে না। মনে রেখ, এটা শোকের ঘটনা, আজ শোকের দিন।

হেড স্যারের বলা শেষ হলে সন্তোষবাবু তাঁর হুইশল্ বাজালেন। ছেলেরা অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল, তারপর বাঁয়ে মোড় নিয়ে দাঁড়াল। তারপরই শুরু হল প্যারেডে যাত্রা।

অধীর ফিস্‌ফিস্ করে বলে, শচীনবাবু কালও আমার হোমটাস্ক হয়নি দেখে মেরেছিলেন।

শঙ্কর পিছনে। সে বলল, আমাকে গুড দিয়েছিলেন।

মরে গেলে কী হয় রে?

ভূত।

তা বলছি না, মরে যাওয়াটা কেমন? অধীর ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে। শংকর ভেবে-টেবে বলে, ঘুমনোর মত, খুব গাঢ় ঘুম।

অধীর মাথা নাড়ল, বুঝেছে।

বড্ড গরম, ছেলেদের পায়ে পায়ে ধুলো উড়ছে। ল্যাংড়া বাগানের ইজারা নিয়েছে একজন বিহারী। বাগানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সবাই ক্যানেস্তারার শব্দ শুনল। কাক আর বাঁদর বড় উৎপাত করে। পাঁচ সাতজন বিহারী লোক তাই খাটিয়া পেতে বসে সারা দিনরাত বাগান পাহারা দেয়, দেখা গেল, তাদের ঝোপড়ার সামনে উনুন জ্বলছে, একজন লোক থালার মত বড় বড় মোটা রুটি সেঁকছে আগুনে। একবার চোখ তুলে ছেলেদের মার্চ দেখল, আবার রুটি সেঁকতে লাগল। শচীনবাবুর মৃত্যুতে ওদের কিছু যায় আসে না।

বাড়িটা অনেক দূর। ছেলেরা আম বাগানের দিকে লোভী চোখে চেয়ে দেখতে দেখতে বাগান পেরিয়ে গেল। আশপাশের বাড়িঘর থেকে লোকজন উঁকি মেরে দেখছে, মেয়েরাই বেশি। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করছে, কী হয়েছে ও ছেলেরা?

কী হয়েছে তা অবশ্য টুটুও জানে না। তবে জানে যে, তার বাবা মারা গেছে। কাল রাতে সে বাবার কাছে গল্প শুনেছে। বাবার কোলে চড়েছে। বাবা ইস্কুলে যাওয়ার আগে কাল তাকে স্নানও করিয়েছে। ঘুম থেকে আজ সকালে উঠেই সে শুনল দিদি শান্তি তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলছে, টুটুর, টুটু, বাবা মরে গেছে···

প্রথমটায় খুব গম্ভীর হয়ে ছিল টুটু। দিদি কাঁদছে যখন তখন নিশ্চয়ই খুব খারাপ কিছু। দিদির কোলে আজকাল সে ওঠে না। বড় হয়েছে তো, মাঝে মধ্যে পুরোনো অভ্যাসের বশে বাবার কোলে উঠে বসত। আর ঘুমের সময়ে কখনো কখনো মায়ের কোলে। কিন্তু আজ সকালে দিদি তাকে কোলে নিয়ে বাইরের ঘরে এল। সেখানে মেঝেতে একটা বিছানা পাতা। বাবা টান হয়ে শুয়ে। মুখটা হাঁ।

হাঁ মুখটায় বোকা ভাব দেখে টুটুর হাসি পাচ্ছিল। হেসে ফেলেও ফের গম্ভীর হয়ে যায়। ঘরে অনেক লোক। আশেপাশের বাড়ি থেকে মাসি-পিসি কাকী বলে যাদের ডাকে টুটু তারা সব এসেছে, গোল হয়ে ঘিরে বসে আছে মাকে। মা খুব স্থির হয়ে বসে আছে।

অনেকক্ষণ বাদে মা বলল, শাম্বি, টুটুকে মুখ-টুক ধুইয়ে দে।

টুটু মুখ ধুয়ে আসতেই পাশের বাড়ির অনিলা মাসি এসে নিয়ে গেল তাকে। বলল, আয় টুটু, আমাদের বাড়িতে আজ থাকবি।

টুটু সেখানে গিয়ে হালুয়া আর দুধ খেয়েছে। তারপর সারা সকাল অনিলা মাসির মেয়ে মানি, নানি আর ছেলে গজুর সঙ্গে খেলেছে, এক্কা দোক্কা, গুটি, কানামাছি। রোজ যেমন দিন যায়, তেমনি একটা দিন। লোকে বলছে তার বাবা মারা গেছে। সে গিয়ে অনিলা মাসির বড় মেয়ে পূর্ণিমা দিদিকে জিজ্ঞেস করল, বাবা আর আসবে না?

পূর্ণিমা দিদি তাকে তাকে আদর করে বলল, আসবে।

মরে গেল কেন?

ঐ একটু অসুখ হয়েছিল তো, তাই হাসপাতালে যাবে।

হাসপাতালে যাওয়াকেই মরে যাওয়া বলে?

হ্যাঁ।

টুটু বুঝল। বাবা ফের আসবে। সে খেলতে লাগল। মানি দৌড়ে এসে খবর দিল, টুটু, দেখ এসে, ইস্কুলের ছেলেরা আসছে মার্চ করে। একজনের হাতে ফুল। তোদের বাড়ি যাচ্ছে।

টুটু জানালায় উঠে দেখল। কত ছেলে। কেমন লাইন দিয়ে এসে থামল তাদের বাসার সামনে। খুব অবাক হয়ে দেখল সে। হাততালি দিল আনন্দে।

শোক নয়, প্রচণ্ড বিস্ময়ে কিছুক্ষণ মূক হয়ে ছিল শচীনবাবুর বৌ খেয়া। তার নামটা রেখেছিল তার বাবা, লোকটা কবিতা লিখত। মাত্র পনেরো বছর সে ঘর করেছে শচীন রায়ের। যখন বিয়ে হয় তখন মানুষটার বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ-ছঁয়ত্রিশ; খেয়ার বয়স তখন মাত্র কুড়ি কি একুশ। ভোর রাতে লোকটা তাকে ডেকে তুলল, বলল, বুকে বড় ব্যথা হচ্ছে।

এর আগে তিনদিন কথা বন্ধ ছিল দু'জনের। খেয়া একটা পছন্দ করা ব্লাউজ পীস কিনেছিল। শচীন তাতে রেগে গিয়ে বলেছিল, পয়সা খুব সস্তা দেখেছ! তারপর ঝগড়া। প্রায়ই এরকম হয়। তবু শচীনের সঙ্গে বেশ মানিয়ে গিয়েছিল খেয়াকে। বয়সে অনেক বড় বলে একটা স্বাভাবিক শ্রদ্ধাবোধ ছিল। খেয়া কখনো সমানে সমানে ঝগড়া করা কি মুখে মুখে জবাব দেওয়া, এসব করত না। খুব ভাবলে বা চিন্তা করলে দেখা যাবে, তারা সুখী দম্পতি ছিল।

কিন্তু সে ভাবনা কে ভাববে! তিনদিন পর লোকটা প্রথম কথা বলল ডেকে। কি কথা! বলল, বুকে বড় ব্যথা হচ্ছে।

রাগ ভাঙানোর জন্য পুরুষরা কত ছল করে। মিথ্যে করে অসুখের কথা বানিয়ে বলে। খেয়াও উন্মুখ ছিল। পাশ ফিরে ঐ ব্যথা বুকে মুখ গুঁজে বলে, বুকে তো আমারও ব্যথা।

শচীন তাকে বুকের মধ্যে টেনে বোধহয় আদর করার চেষ্টা করছিল। খুব অস্পষ্ট গলায় বলে, টাকা পয়সার সুখ তো তোমাকে দিতে পারি না, কত কষ্টে সংসার কর তুমি। ভাল ঘরে পড়লে কত সুখী হতে!

এর চেয়ে ভাল ঘর আর কোথায় আছে! তুমি শুধু একটু বেশি ভালবেসো আমায়, আর কিছু চাই না।

তার উত্তরে যা বলবার তা বলতে পারল না শচীন। যে হাতে খেয়াকে জড়িয়ে ধরেছিল সে হাতটা টেনে নিয়ে নিজের বুকে রেখে বলল, বড় ব্যথা খেয়া।

খেয়া তখন উঠে বসে। হঠাৎ তখন মনে পড়ল তার স্বামীর বয়স খুব কম হয়নি। রোগব্যাধি এমনিতে কিছু নেই। শচীনও প্রায় বলত আমাদের দেশে মাস্টাররাই সবচেয়ে বেশি বাঁচে। খোঁজ নিয়ে দেখ, মাস্টাররা মরার বিহিত সময় পার করেও বহুকাল বেঁচে থাকে। মাস্টারীর ঐ একটা গুণ। কথাটা ঠাট্টাই, তবু শুনতে শুনতে একটা ওরকম বিশ্বাসও এসে গিয়ে থাকবে খেয়ার।

শচীনের বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল খেয়া। শচীন বড় বেশি কাতর শব্দ করছিল। হঠাৎ চোখ খুলে বলল, ডাক্তার ডাকো, ব্যথাটা বাড়ছে, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। সেই শুনে হিম হয়ে গেল খেয়া।

ডাক্তার বলতে দোমোহানীতে আর কে! তবু শশধরবাবুকে খবর দেওয়া হল। তিনি এসে ইঞ্জেকশন দিলেন। ওষুধও আনা হল। আটটা বাজবার মিনিট পাঁচেক তখন বাকি। শচীন খুব স্বাভাবিক কয়েকটা হেঁচকি তুলল। শরীরটা সঙ্কুচিত হয়ে প্রসারিত হল বার কয়। তারপর স্থিরতা।

বিশ্বাস করা যায়! ভোর রাতে লোকটা তাকে বুকে টেনে নিয়ে একটু আদর করেছিল। সেই স্পর্শ যে এখনো খেয়ার গায়ে লেগে আছে।

ছেলেরা ভিড় করে এসে দাঁড়িয়ে দরজায়। একে একে হাত জোড় করে নমস্কার করে চলে যাচ্ছে। ঘরে পাড়াপ্রতিবেশী, শচীনের

সহকর্মীদের ভিড় বাড়ছে। কত মালা, ফুল, কত সান্ত্বনার কথা। তবু খেয়ার মনের মধ্যে এক ভোর রাত্রির আলো আঁধারির বিস্ময়। সে বুঝছে পারছে না কিছু। ভাবছে, এই অবস্থাতেও ভাবছে, টুটু কি খেয়েছে পেট ভরে? এঁটো বাসন-কোসন কি মেজে দিল ঝি এসে! বাসি কাপড় এখনও ছাড়া হয়নি! এইসব অবান্তর কথা কেন যেন মনে আসছে! কে একজন কানের কাছে বলল, কাঁদো, কাঁদো, না কাঁদলে বুক হাল্কা হবে না খেয়া। খেয়া কাঁদল, এবং টের পেল তার বড্ড খিদে পেয়েছে।

ক্লাস ফাইভের একটা পুঁটে ছেলে গৌর সারা রাস্তা গোঁয়ারের মত প্যারেড করেছে। শচীন স্যারের বাড়ি যে স্কুল থেকে এত দূরে তা তার জানা ছিল না। পা ব্যথা করছে, জুতোর মধ্যে কাঁকর ঢুকেছে, ঘামে ভিজে গেছে গা, গলা শুকিয়ে কাঠ। ড্রিল স্যারের ভয়ে সে জুতোর কাঁকরটা বের করতে পারেনি; কী কষ্ট। জলতেষ্টায় সে মরে যাচ্ছে।

শচীন স্যারের ঘরে স্যার শুয়ে আছে, সে দেখল। স্যার মারা গেছে। ওই শোকের দিন, হেডমাস্টারমশাই বলেছিলেন। হাসা বারণ, কথা বলা বারণ। সে তাই কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না। কিন্তু তার খুব জলতেষ্টা পেয়েছে। সারিবদ্ধভাবে ছেলেরা এগোচ্ছে। সেও লাইন ধরে এগিয়ে গিয়ে সকলের মত নমস্কার করল। তারপর লাইন ধরে এগিয়ে যেতে লাগল। কোথায় যাচ্ছে জানে না। জলতেষ্টায় তার হেঁচকি উঠছে। এমন জলতেষ্টা তার কোনদিন পায় না। তার এখন মায়ের কাছে চলে যেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু ছুটি হয়নি, কেউ তাকে বাড়ি যেতে বলছে না। ছেলেটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। বন্ধুরা অমনি ঘিরে ধরল তাকে।

এ মা! অঞ্জন কাঁদছে।

স্যার অঞ্জন কাঁদছে!

অঞ্জন কি হয়েছে?

অঞ্জন জবাব দেয় না। কেবল কাঁদে। বড়দের তার বড় ভয়। সকলের ওপর তার বড় অভিমান। শচীন স্যার মারা গেছেন। কথা বলা বারণ, হাসা বারণ। এতদূর হেঁটে আসতে হয়েছে। তেষ্টা পেয়েছে। জুতোয় কাঁকর। এসব কথা কেউ কি বোঝে!

ফুল আর ধূপকাঠির গন্ধ আসছে। প্রচণ্ড শব্দে খোল বাজিয়ে

একদল কীর্তনীয়া এসে গান গাইতে শুরু করল। প্রচণ্ড রোদে দাঁড়িয়ে অঞ্জন কাঁদে। তার গায়ে ঘামাচিগুলো চিটির চিটির করে।

কে একজন হঠাৎ কোলে তুলে নিল তাকে। তারপর দৌড়ে চলে এল একটা বাড়ির ভিতরে। খুব অবাক হয়ে অঞ্জন দেখে, তার মায়ের মতই একজন। শাঁখা, শাড়ি, সিঁদুর পরা। বিছানার ওপর বসিয়ে দিয়ে হাতপাখার হাওয়া করতে করতে বলল, বাচ্চাদের আবার কেন এতদূরে এনে কষ্ট দেওয়া! ওরা মরার ব্যাপার কী বুঝবে।

ভারী সুন্দর ঠাণ্ডা ঘর। কেমন ছায়া। মায়ের মত মহিলাটি তাকে ঠাণ্ডা জল খাওয়াল, দুটি মোয়া দিল খেতে। অঞ্জনের খুব লজ্জা করছিল।

শচীন রায় দোমোহানীতে মারা গিয়েছিল বিশ বছর আগে। বিশ বছর পরে তার মৃত্যুর দিনটাকে সবাই ভুলে গেছে। কত কি ঘটে পৃথিবীতে। তুচ্ছ সব ঘটনা কোথায় ভেসে যায়। পলহোয়েল ইস্কুলের ইংরিজির মাস্টারমশাইকে কে মনে রাখবে!

হোমটাস্ক না করার জন্য যে ছেলেটিকে শচীনবাবু মৃত্যুর আগের দিনও মেরেছিলেন সে বিলেত থেকে ফিরে এসেছে। এসেই সে একটা মস্ত চাকরি পেল সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্টে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা তার মা তাকে বলল, চমৎকার একটা পাত্রী আছে। পয়সা-কড়ি নেই, মামাবাড়িতে মানুষ। মেয়েটাকে আমার বড় পছন্দ। কথায় কথায় জানলুম তারা দোমোহানীতে ছিল। তোমাদের মাস্টার ছিল শচীন রায়, তার ছোট মেয়ে।

শচীন রায়! অধীর ভ্রূ কোঁচকায়, কে বলতো। বলেই তার মনে পড়ে ওঃ, শচীনবাবু, যিনি মারা গিয়েছিলেন!

খুব আবছা স্মৃতি। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ল যেদিন শচীনবাবু মারা যান সেদিন ল্যাঙড়াবাগানে একটা লোক মস্ত বড় বড় রুটি সেঁকছিল। খুব স্পষ্ট সেই রুটিগুলোর কথা মনে আছে। অত বড় রুটি! ভাবতে অবাক লাগে।

শঙ্করের পসার এখন ভালই, কলকাতার এক হাসপাতালে সে ডাক্তার। সারাদিন ভাবাভাবির সময় বড় কম। বৌ আর একটা ছেলের সঙ্গে সময় বেশী কাটাতে পারে না। ছেলেটা বড় বায়নাদার, গল্প শুনতে খুব ভালবাসে। সময় পেলে তাকে গল্প বলে শঙ্কর। ছেলেবেলার গল্প। বলে আমরা গুরুজনদের কত ভক্তিশ্রদ্ধা

করতাম, ইস্কুলের মাস্টারমশাইদেরও। একবার একজন মারা গিয়েছিল, আর আমরা প্যারেড করে···গল্পটা খুব আবছা। ঘটনাটা মনে নেই। কেবল সেই মৃত শিক্ষক কী যেন নাম, তাঁর ঘরের দরজায় দাঁড়াতেই সে দুটো সাদা পদতল দেখেছিল। কী সাদা! আর কি রকম শক্ত। কিছুই ভুলতে পারে না। সে তো জানে রিগর মরটিস হলে শরীর শক্ত হয়ে যায়। সে নিজে ডাক্তার, কত মড়া দেখেছে। তবু ঐ পা দু'খানার কথা খুব মনে আছে।

অঞ্জনের খুব তেষ্টা পেয়েছে মাঝরাতে। উঠে বসেছে। সে একটা মেসবাড়িতে থাকে। এম. এ পাশ করে চাকরি পায়নি বলে 'ল' পড়ছে। 'ল' পড়তে পড়তে একটা চাকরিও পেয়ে গেছে তখন। ভাল চাকরি, একটা নতুন স্পন্সসর্ড কলেজের প্রফেসর। মেসে থেকে চাকরি করে আর পড়ে।

মেসের চাকরিটা বিকেলে কুঁজোয় জল ভরে রাখেনি। তেষ্টা পেয়েছে। অঞ্জন উঠে পাশের ঘরে গিয়ে অন্যের কুঁজোর জল ভরে অনেকখানি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে খেল। আর সেই সময়ে খুব হাসি পাচ্ছিল তার। সে তখন ফাইভে পড়ে, কে একজন স্যারের মৃত্যুতে প্যারেড করে গিয়েছিল তাঁর বাড়িতে। আর তখন খুব তেষ্টা। একজন মহিলা নয় দশ বছর বয়সী অঞ্জনকে কোলে নিয়ে গিয়ে জল খাইয়েছিল। সেই মহিলাকে মনে নেই, কেবল সেই তেষ্টা আর কোলে ওঠাটা মনে পড়ে।

বিয়ের দিন টুটুর শুকনো মুখখানা বার বার দেখছিল খেয়া। সেই ভোররাতে দধিমঙ্গল হয়েছে, তারপর আর কিছু খায়নি। সন্ধ্যেয় বিয়ে। পাত্র সেই পলহোয়েল ইস্কুলে পড়ত। কে তা আর মনে নেই। তবে ভাবতে ভালই লাগে, সেই মানুষটার কৃতী ছাত্রই এসেছে বিয়ে করতে টুটুকে।

বার বার এসে জিজ্ঞেস করে খেয়া, ও টুটু, একটু সরবৎ খাবি? একটু ঘোল করে দিই? দুটো সন্দেশ মুখে দে না।

এইসব বলে আর মনের মধ্যে নানা তাপদগ্ধতার মধ্যে হঠাৎ একটা নিষ্ঠুর স্মৃতি আসে। সব ভুলেও ওটুকু ভোলেনি খেয়া। উনি যেদিন মারা যান, তখন সব দুঃখ শোকের ভিতর থেকে একটা তীব্র নির্লজ্জ খিদে কেন চাড়া দিয়েছিল মনে। কেন মনে হয়েছিল, উঠে গিয়ে লুকিয়ে কিছু খেয়ে আসে?

উকিলের চিঠি

ও মিছরি, তোর নামে একটা উকিলের চিঠি এসেছে দেখগে যা। এই বলে মিছরির দাদা ঋতীশ টিয়ার ঝাঁক তাড়াতে ক্ষেতের মধ্যে নেমে গেল।

গোসাবা থেকে দুই নৌকা বোঝাই লোক এসেছে অসময়ে। লাট এলাকার ভিতর বাগে কোন বিষয়কর্মে যাবে সব। এই অবেলায় তাদের জন্য খিচুড়ি চাপাতে বড় কাঠের উনুনটা ধরাতে বসেছিল মিছরি। কেঁপে উঠল। তার ভরন্ত যৌবনবয়স। মনটা সব সময়ে অন্যধারে থাকে, শরীরটা এই এখানে। আজকাল শরীরটা ভার লাগে তার। মনে হয়, ডানা নেই মানুষের।

উকিলের চিঠি শুনে সে উনুন ফেলে দৌড়োবে তার জো নেই। বাবা গুলিপাকানো চোখে দেখছে উঠোনের মাঝখানে চাটাইতে বসে। বড় অতিথিপরায়ণ লোক। মানুষজন এলে তার হাঁকডাকের সীমা থাকে না। তাছাড়া দাদু, ঠাকুমা, মা, কাকা-জ্যাঠারা সব রয়েছে চারধারে। তাদের চোখ ভিতর বার সব দেখতে পায়। উটকো লোকেদের মধ্যে কিছু বিপ্রবর্ণের লোক রয়েছে, তারা অন্যদের হাতে খাবে না। সে একটা বাঁচোয়া, রান্নাটা করতে হবে না তাদের। চাল ডাল ওরাই ধুয়ে নিচ্ছে পুকুরে। বাঁকে করে দু'বালতি জল নিয়ে গেছে কামলারা। উনুনটা ধাঁধিয়ে উঠতেই মিছরি সরে গিয়ে আমগাছ-তলায় দাঁড়াল।

কালও বড্ড ঝড় জল গেছে। এই দক্ষিণ ধার থেকে ফৌজের মতো ঘোড়সওয়ার ঝড় আসে মাঠ কাঁপিয়ে। মেঘ দৌড়োয়, ডিমের মতো বড় বড় ফোঁটা চটাসফটাস ফাটে চারধারে। আজ সকালে দশ ঝুড়ি পাকা জাম, গুটিদশেক কচি তাল কুড়িয়ে আনা হয়েছে ক্ষেত থেকে। ঘরের চালের খড় জায়গায় জায়গায় ওলট-পালট। মাটির দেওয়াল জল টেনে ডোস হয়ে আছে, এখন চড়া রোদে শুকোচ্ছে সব। আম-তলায় দাঁড়িয়ে মিছরি দেখে, ঋতীশ দাদা টিয়ার ঝাঁক উড়িয়ে দিল।

ট্যাঁ ট্যাঁ ডাক ছেড়ে সবুজ পাখিরা উড়ে যাচ্ছে নদীর দিকে। মনে হয়, মানুষের ডানা নেই।

যারা এসেছে তারা সব কেমন ধারা লোক যেন! রোগা-ভোগা ভীতু-ভীতু চেহারা, পেটে সব খোঁদল-খোঁদল উপোসী ভাব। জুল-জুল করে চারধারে চায় আর লজ্জায় আপনা থেকেই চোখ নামিয়ে নেয়। তাদের মধ্যে একজন আধবুড়ো লোক এসে উনুনটায় দুটো মোটা কাঠ ঢুকিয়ে দিল, ফুলঝুরির মতো ছিটকে পড়লো আগুনের ফুলকি। একটা কাঠ টেনে আধপোড়া একটা বিড়ি ধরিয়ে নিল লোকটা। এই গরমেও গায়ের ঘেমো তিলচিটে গেঞ্জীটা খুলছে না, বুকের পাঁজরা দেখা যাবে বলে বোধ হয় লজ্জা পাচ্ছে। তাকে দেখে হাসি পেল মিছরির।

সেই লোকটা চারধারে চেয়ে মিছরিকে দেখে কয়েক কদম বোকা পায়ে হেঁটে এসে বলল—আনাজপাতি কিছু পাওয়া যায় না?

ক্ষেত ভর্তি আনাজ। অভাব কিসের? মিছরি বলল—এক্ষুনি এসে পড়বে। ক্ষেতে লোক নেমে গেছে আনাজ আনতে।

একটু হলুদ লাগবে, আর কয়েকটা শুকনো লঙ্কা। যদি হয়তো ফোড়নের জন্য একটু জিরে আর মেথি।

যদি হয়! যদি আবার হবে কি! খিচুড়ি রাঁধতে এসব তো লাগেই সে কি আর গেরস্তরা জানে না! মা সব কাঠের বারকোশে সাজিয়ে রেখেছে।

লোকটার দিকে চেয়ে মিছরি বলল—সব দেওয়া হচ্ছে। ডাল চাল ধুয়ে আসুক।

লোকটা আকাশের দিকে একবার তাকাল। খুব সংকোচের গলায় বলল—বেলা হয়েছে।

সে কথার মধ্যে একটা খিদের গন্ধ লুকিয়ে আছে। শত চেষ্টা করেও লোকটা খিদের ভাবটা লুকোতে পারছে না। গেঞ্জীতে ঢাকা হলেও ওর পাঁজরা দেখা যায়। কারা এরা? কোথা থেকে এল, কোথাই বা যাচ্ছে? ছোটো বোন চিনি যদিও মিছরির পিঠোপিঠি নয় তবু বোনে বোনে ঠাট্টা ইয়ার্কির সম্পর্ক। ফ্রকপরা চিনি তিনটে ব্যাঙ লাফ দিয়ে মশলার বারকোশ নিয়ে এসে ঠক করে উনুনের সামনে উঠোনে রেখে ঝুপসি চুল কপাল থেকে সরিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—এই যে মশলা দিয়ে গেলাম কিন্তু। দেখ সব, নইলে চড়াই খেয়ে যাবে।

রোগা লোকটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বারকোশটা নীচু হয়ে দেখল।

বলল—উরে ব্বাস, গরমমশলা ইস্তক। বাঃ, বাঃ, এ নাহলে গেরস্ত!

চিনি দুটো নাচুনী পাক খেয়ে মিছরির ধারে এসে জিভ ভ্যাঙাল, বলল—যা দিদি, তোর নামে উকিলের চিঠি এসেছে। বড্ড মোকদ্দমায় পড়ে গেছিস ভাই। চিঠিটা ভিজিয়ে একটু জল খাস শোওয়ার সময়, মিষ্টি লাগবে।

বলে নিচু ডালের একটা পাকা আম দু'বার লাফ দিয়ে পেড়ে ফেলল চিনি। শিঙে দিয়ে চুষতে চুষতে যেদিকে মন চায় চলে গেল।

উকিলের চিঠি বলে সবাই ক্ষ্যাপায়। আর মোকদ্দমাও বটে। এমন মোকদ্দমায় কেউ কখনো পড়েনি বুঝি।

ধীর পায়ে লাজুক মুখে মিছরি ঘরে আসে। এমনিতে কোনো লাজলজ্জার বালাই নেই। বাপের বাড়ীতে হেসে খেলে সময় যায়। কিন্তু ঐ চিঠি যেদিন আসে সেদিন যত লজ্জা। বরের চিঠিই যেন বর হয়ে আসে।

মিছরির বর উকিল।

ছোটোকাকা প্রায় সমান বয়সী। দাদা ঋতীশের চেয়েও ছ'মাসের ছোটো। আগে তাকে নাম ধরেই 'শ্যামা' বলে ডাকত মিছরি, নিজের বিয়ের সময় থেকে 'ছোটো কাকা' বলে ডাকে।

ছোটো কাকা মিছরির নাকের ডগায় দু'বার নীলচে খামখানা নাচিয়ে ফের সরিয়ে নিয়ে বলল—রোজ যে আমার কাপড় কাচতে খিটখিট করিস, আর করবি?

অন্য সময় হলে মিছরি বলত—করব, যাও যা খুশী করোগে।

এখন তা বলল না। একটু হেসে বলল—কাপড় কাচতে খিটখিট করব কেন, তোমার নস্যির রুমাল বাবু ও কাচতে বড় ঘেন্না হয়।

—ইঃ ঘেন্না! যা তাহলে চিঠি খুলে পড়ে সবাইকে শোনাবো।

—আচ্ছা, আচ্ছা, কাচবো।

—আর কি কি করবি সব বল এই বেলা। বৌদি রান্না করে মরে, তুই একেবারে এগোস না, পাড়া বেড়াস। আর হবে সেরকম?

—না।

—দুপুরে আমার নাক ডাকলে আর চিমটি কাটবি?

—মাইরি না।

—মনে থাকে যেন! বলে ছোটোকাকা চিঠিটা শুঁকে বলল—এঃ আবার সুগন্ধী মাখিয়েছে!

বলে কাকা চিঠিটা ফেলে দিল সামনে। পাখির মতো উড়ে চিঠিটা তুলে নিয়ে মিছরি এক দৌড়ে বাগানে।

কত কষ্ট করে এতদূর মানুষ আসে, চিঠি আসে। রেলগাড়িতে ক্যানিং, তারপর লঞ্চে গোসাবা, তারপর নৌকায় বিজয়নগরের ঘাট, তারপর হাঁটা পথ, কত দূর যে! কত যে ভীষণ দূর!

খামের ওপর একধারে বেগনে কালিতে রবার স্ট্যাম্প মারা। কালি জেবড়ে গেছে, তবু পড়া যায়—ফ্রম বসন্ত মিন্দার, বি. এ. এল. এল-বি. অ্যাডভোকেট। আর বাংলায় মিছরির নাম ঠিকানা লেখা অন্যধারে। রবার স্ট্যাম্পের জায়গায় বুঝি এক ফোঁটা গোলাপগন্ধী আতর ফেলেছিল, সুবাস বুক ভরে নিয়ে বড় যত্নে, যেন ব্যথা না লাগে এমনভাবে খামের মুখ ছিঁড়ল মিছরি। এ সময়টায় তাড়াতাড়ি করতে নেই। অনেক সময় নিয়ে, নরম হাতে, নরম চোখে সব করতে হয়। মা ডাকছে—ও মিছরি, আনাজ তুলতে বেলা গেল। লোকগুলোকে তাড়া দে, বিপিনটা কি আবার গ্যাঁজা টানতে বসে নাকি দ্যাখ।

বড় বিরক্তি। লোকগুলোর সত্যি খিদে পেয়েছে। আকাশমুখো চেয়ে উঠোনে হা-ভাতের মতো বসে আছে সব। তাদের মধ্যে যারা একটু মাতব্বর তারা বাবুর সঙ্গে এক চাটাইতে বসে কথাবার্তা বলছে। রান্নার লোকটা বিশাল কড়া চাপিয়ে আধসেরটাক তেল ঢেলে দিল।

মিছরি ক্ষেতে নেমে গিয়ে কুহুস্বরে ডাক দিল—বিপিনদা, তোমার হ'ল? রান্না যে চেপে গেছে। অড়হর গাছের একটা সারির ওপাশ থেকে বিপিন বলে—বিশটা মদ্দ খাবে, কম তো লাগবে না। হুট বলতে হয়ে যায় নাকি! যাচ্ছি, বলো গে হয়ে এল।

মিছরি চিঠিটা খোলে। নীল, রুলটানা প্যাডের কাগজে লেখা। কাগজের ওপরে আবার বসন্ত মিন্দার, এবং তার ওকালতীর কথা ছাপানো আছে। নিজের নাম ছাপা দেখতে লোকটা বড় ভালবাসে।

হুট করে চিঠি পড়তে নেই। একটু থামো, চারদিক দেখ, খানিক অন্যমনে ভাবো, তারপর একটু একটু করে পড়ো, গেঁয়ো মানুষ যেমন করে বিস্কুট খায়, যত্নে ছোট্ট ছোট্ট কামড়ে!

চিঠি হাতে তাই মিছরি একটু দাঁড়িয়ে থাকে। সামনের মাঠে

একটা ছোট ডোবায় কে একজন কাদামাখা পা ধুতে নেমেছিল। জলে নাড়া পড়তেই কিলবিলিয়ে একশ জোঁক বেরিয়ে আসে। মিছরি দেখতে পায়, লোকটা মাঠে বসে পায়ের জোঁক ছাড়াচ্ছে। ক্ষেতের উঁচু মাটির দেওয়ালের ওপর কোন কায়দায় একটা গরু উঠে পড়েছে কে জানে। এইবার বাগানের মধ্যে হড়াস করে নেমে আসবে।

নামুকগে। কত খাবে! বাগান ভর্তি সব্জী আর সব্জী। অঢেল অফুরন্ত। বিশ বিঘের ক্ষেত, খাক।

উকিল লিখেছে—হৃদয়াভ্যন্তরস্থিতেষু প্রাণপ্রতিমা আমার…। মাইরি, পারেও লোকটা শক্ত কথা লিখতে। লিখবে না! কত লেখাপড়া করেছে।

হু হু করে বুক চুপসে একটা শ্বাস বেরিয়ে যায় মিছরির। লোকটা কত লেখাপড়া করেছে তবু রোজগার নেই কপালে! এ কেমন লক্ষ্মীছাড়া কপাল তাদের।

উকিল লিখেছে,—ঘুমিয়া জাগিয়া কত যে তোমাকে খুঁজি! একটু থমকে যায় মিছরি। কথাটা কি! ঘুমিয়া? ঘুমিয়া মানে তো কিছু হয় না। বোধহয় তাড়াহুড়োয় ঘুমাইয়া লিখতে গিয়ে অমনটা হয়েছে। হোকগে, ওসব তো কত ভুল হয় মানুষের। ধরতে আছে?

ছ্যাঁক করে ফোড়ন পড়ল তেলে। হিং ভাজার গন্ধ। রান্নার লোকটা বুঝি কাকে বলল—এর মধ্যে একটু ঘি হলে আর কথা ছিল না।

জ্যাঠা বোধ হয় সান্ত্বনা দিয়ে বলল হবে হবে। তা মিছরি, পাথরবাটিতে একটু ঘি দিয়ে যা দিকিনি!

মিছরি আর মিছরি! ও ছাড়া বুঝি কারো মুখে কথা নেই। মিছরি নড়ল না। চিঠি থেকে চোখ তুলে উদাসভাবে আকাশ দেখল। আবার একটা টিয়ার ঝাঁক আসছে গাঙ পেরিয়ে। আসুক।

ছোটকাকার এক বন্ধু ছিল। ত্র্যম্বক। মিছরির বিয়ের আগে খুব আসত এ বাড়িতে। বিয়ের পর আর আসে না। কেন বলো তো! মিছরি উদাস চেয়ে থাকে। কোনোদিন মনের কথা কিছু বলেনি তাকে ত্র্যম্বক। কিন্তু খুব ঘন ঘন তার নাম ধরে ডাকত। সিগারেট ধরাতে দশবার আগুন চাইত।

কেন যে মনে পড়ল!

উকিল লিখেছে—ত্রিশ টাকার মধ্যে কলিকাতায় ঘর পাওয়া যায় না। অনেক খুঁজিয়াছি। মাঝে মাঝে ভাবি বনগাঁ চলিয়া যাইব। সেখানে প্র্যাকটিসের সুবিধা হইতে পারে। বাসাও সস্তা।

তাই যদি যেতে হয় তো যাও। আমি আর পারি না। বিয়ের পর এক বছর চার মাস হল ঠিক ঠিক। আর কি পারা যায়, বলো উকিলবাবু। তোমার পাষাণ হৃদয়। তার ওপর পুরুষমানুষ, লাফঝাঁপ করে তোমাদের সময় কেটে যায়। আর আমি মেয়েমানুষ, লঙ্কাগাছে জল ঢেলে কি বেলা কাটে আমার, বলো? চোখের নোনা জলে নোনা গাঙে জোয়ার ফেলে দিই রোজ। উকিলবাবু, পায়ে পড়ি।

খিচুড়িতে আলু, কুমড়ো, ঢ্যাঁড়স, ঝিঙে পটল সব ঢেলে দিয়ে রোগা বামুনটা আম গাছের তলায় জিরেন নিচ্ছে। গলায় ময়লা মোটা পৈতেটা বেরিয়ে গেঞ্জীর ওপর ঝুলে আছে। বড্ড রোগা, ঘামে ভিজে গেছে তবু গেঞ্জি খোলেনি পাঁজরা দেখা যাওয়ার লজ্জায়। বিড়ি ধরিয়ে ছোটকাকাকে বলল -বৌ আর ছেলেপিলেদের সোনারপুর ইস্টিশানে বসিয়ে রেখে আমরা বেরিয়ে পড়েছি। তারা সব কদিন ভিক্ষে-সিক্ষে করে খাবে। ঠিক করেছি বাদার যেখানে পাব জমি দখল করে ঘর তুলে ফেলব আর চাষ ফেলে দেবো। মশাই, কোনোখানে একটু ঠাঁই পেলাম না আমরা। বাঁচতে তো হবে নাকি!

ছোটকাকা বলে, কতদূর যাবেন? ওদিকে তো সুন্দরবনের রিজার্ভ ফরেস্ট আর নোনা জমি। বাঘেরও ভয় খুব। লোকটা বিড়ি টেনে হতাশ গলায় বলে, আসতে আসতে এতদূর এসে পড়েছি আর একটু যেতেই হবে। বাঘেরও খিদে, আমাদেরও খিদে, দুজনাকেই বেঁচে থাকতে হবে তো।

উকিলবাবু আর কি লেখে? লেখে - সোনামণি, আমার তিনকুলে কেহ নাই, নইলে তোমাকে বাপের বাড়ি পড়িয়া থাকিতে হইত না। যাহা হউক, লিখি যে আর কয়দিন ধৈর্য ধর। কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু হইবেই। ওকালতীতে পসার জমিতে সময় লাগে।

বুঝি তো উকিলবাবু, বুঝি। তোমার যেদিন পসার হবে ততদিন আমি থাকব তো বেঁচে! যদি মরে যাই, তবে তোমার লক্ষ্মীমন্ত ঘরে আর কোন না কোন পেত্নী এসে আমার জায়গায় ডেঁড়েমুশে সংসার করবে। বালা বাজিয়ে হাওয়া খাবে, মাছের মুড়ো চিবোবে, গাল ভরতি পান খেয়ে রুপোর বাটায় পিক ফেলবে। ততদিন কি

বাঁচব উকিলবাবু ?

বিপিন কলাপাতা কেটে উঠোনে ফেলছে। ঠেলাঠেলি পড়ে গেছে দলটার মধ্যে। ঝপাঝপ পাতা টেনে বসে পড়ল সব। বাঁ হাতে সকলের পাঁচ ছটা করে কাঁচালঙ্কা, পাতে একথাবা নুন। খিচুড়ি এখনো নামেনি। সবাই কাঁচালঙ্কা কামড়াচ্ছে নুন মেখে। ঝালে শিস দিচ্ছে।

উকিলবাবু কি লেখে আর ? লেখে—বন্ধুর বাসায় আর কতদিন থাকা যায় ? ভাল দেখায় না। ধারও অনেক হইয়া গেল। লজ্জার মাথা খাইয়া লিখি, কিছু টাকা যদি পারো···

গরম খিচুড়ী মুখে দিয়ে একটা বাচ্চা ছেলে চেঁচিয়ে উঠে জিভের যন্ত্রণায়। একজন বুড়ো বলে—আস্তে খা। ফুঁইয়ে ফুঁইয়ে ঠান্ডা করে নে।

—উঃ, যা রেঁধেছো না হরিচরণ, লাট বাড়ির বাস ছেড়েছে।

মিছরি আমতলায় দাঁড়িয়ে থাকে। বেলা হেলে গেছে। গাছতলায় আর ছায়া নেই। রোদের বড় তেজ।

দলের মাতব্বর জিজ্ঞেস করে মিছরির বাবাকে—ওদিকে কি কোনো আশা নেই মশাই ? অ্যাঁ ! এত কষ্ট করে এতদূর এলাম।

মিছরি ঘরে চলে আসে। চোখ জ্বালা করছে। বুকটায় বড় কষ্ট।

পড়ন্ত বেলায় মিছরি তার উকিলকে চিঠি লিখতে বসে—আশা হারাইও না। পৃথিবীতে অনেক জায়গা আছে···।

প্রণয়চিহ্ন

দুখিয়া ডাগর হয়েছে, সেটা বড় কথা নয়। আসল কথা হল দুখিয়ার হাত খুব পরিষ্কার মাথা খুব সাফ। গদাধরবাবুদের বাগানে এখন সব্জীর খুব তেজ। বড় বাগান। ম' ম' করছে কাঁচা মাটি আর গাছপালার গন্ধ। একটা খোঁড়া কুকুর আর এক বুড়ো মালী বাগান পাহারা দেয়। অত বড় বাগান, তিন চার বিঘে তো হবেই, পাহারা দেওয়া কি সোজা!

মগন একটু দূরে রাস্তার পাশে একটা ঢিবির ওপর শিশু গাছের নীচে দাঁড়িয়ে। দুখিয়াকে দেখা যাচ্ছে না, শুধু একবার একটা সর্পিল হাত দেখতে পেল মগন. ঝিঙে মাচানের ছায়ায় একটা লম্বা ঝিঙে টুক করে ছিঁড়ে নিল। বুড়ো মালী সীতুয়া খোঁড়া কুকুরটাকে খেতে ডেকেছে একটু আগে. আ তু—উ. আঃ। দিগ্‌বিদিগজ্ঞানশূন্য কুকুরটা দৌড়চ্ছে সেই ডাক শুনে। এই ক্ষণটার জন্যই অপেক্ষা করছিল মগন আর দুখিয়া।

ডাকটা শুনেই দুখিয়া বাপের দিকে চেয়ে হাসল, চোখে চিকমিক করছে বুদ্ধি।

হ্যাঁ. দুখিয়া ডাগর হয়েছে বটে। তেরো হতে পারে. বা চোদ্দ, অত হিসেব নেই মগনের। চটের বিছানায় তারা বাপ-বেটি শুয়ে থাকে গুটিশুটি হয়ে। তখন মেয়ের গা থেকে শিশুর গায়ের গন্ধই আসে মগনের নাকে মেয়েটা বড় হল কবে তাহলে?

বাগানের গাছ-গাছালিতে একটু দুলুনি। কখনো এখানে কখনো সেখানে। হরিণের মত দীঘল চেহারার মেয়েটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, টের পাওয়া যাচ্ছে। মগন গনগনে রোদে গাঢ় সবুজ সমারোহের মধ্যে একটা সর্পিল নড়াচড়া লক্ষ্য করতে করতে আপনমনে হাসে আর আর ঘাড় নাড়ে। দুখিয়া ডাগর হয়েছে. আর সন্দেহ নেই।

মগনের পেটে যে খোঁদল তার ধারণা সেটা হয়েছে পিঠের কুঁজটা থেকে। এই খোঁদলটায় তার যত সমস্যা। গরু সারাদিন খায় আর

খায় কিন্তু শালার পেট আর ভরে না। মগনেরও তাই। পিঠের কুঁজ থেকে পেটের খোঁদল অবধি জায়গা অনেকটা। ভর্তি করা বড় সহজ নয়। কী দিয়ে ভরবে খোঁদল? দেশে একটু খেতি গেরস্তি ছিল বটে, কিন্তু তারা পাঁচ ভাই। ভাগে-জোগে যা জুটত তা দিয়ে খোঁদল ভর্তি হওয়ার নয়। বুড়ো বাপ বহুদিন যাবৎ বলে আসছে তোরা এক আধজন এবার তফাৎ হ'। পেট বাড়ল মগনের গাওনা হওয়ার পর। তারপর দুখিয়া জন্মানোয় ফের আর এক পেট। তবে বউটা কুঁজো মগনের ঘর করতে চাইত না। মাতনু মগনের পরের ভাই। তার সঙ্গে থাকতে লাগল। মগন বউকে ঢিট করতে দুখিয়াকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল একদিন।

সেই থেকে দুখিয়া আর সে। সে আর দুখিয়া। সে যেমন দুখিয়ার প্রতিটা শ্বাসের হিসেব রাখে, দুখিয়াও জানে বাপের বুক ক'বার ধুকধুক করে।

কিছু কাজকাম ছিল মগনের। এখনো আছে। আগে সে মাটি কাটত। পিঠের কুঁজ নিয়েই। ক্ষেত মজুর খাটত। এখন সে চাটাই বোনে। বাপ-বেটির তাতে চলে যাওয়ার কথা। যায়ও। তবু দুখিয়াকে একেবারে বাচ্চা বয়স থেকে একটু-আধটু চুরির তালিম দিতে হয়েছিল তাকে। তখন দরকার পড়ত। এখন না হলেও চলে বটে, কিন্তু অভ্যাস রাখা ভাল। দুখিয়াও ভারী খুশি হয় এই কাজটাতে। রেললাইনের ধারের ঝোপড়ায় মগন মেয়েকে নিয়ে থাকে। সেখানে আরো ক'ঘর দেশওয়ালী আছে। তাদের ছেলেমেয়েরাও কিছু কম যায় না দুখিয়ার চেয়ে। কাজটা খারাপ বলে জানে না দুখিয়া। তবে মগন শুনেছে চুরিটা ভাল কাজ নয়।

ভাল কাজ কোন্‌টাই বা? তার বউ যে মাতনুর সঙ্গে থাকে সেটাই কি ভাল কাজ?

মেয়েটা বন-জঙ্গল ভালবাসে। মাটি ভালবাসে। ওর বিয়ে দিতে হবে গেরস্ত লোকের সঙ্গে। জমি আছে, গরু আছে, মোষ আছে এমন বর চাই। কিন্তু পাবে কোথায় মগন। তবে ভরসা এই, তাদের জাতে মেয়ে কিনে বিয়ে করতে হয়। এই দীঘল চেহারার হরিণ-মেয়েটার জন্য ভাল টাকা পেয়ে যেতে পারে মগন, তবে সবই কপাল।

খোঁড়া কুকুরটা খাউ-খাউ করে তেড়ে আসছে না? গাছপালার গন্ধ পেলে মেয়েটার জ্ঞান থাকে না। মগন মুখে আঙুল পুরে শিস

দিল। তীব্র, কর্কশ শব্দ বাতাসটাকে নোংরা করে দেয় যেন।

বাগানের মধ্যে দুখিয়া তখন আত্মহারা। সারাদিন সে কেবল দেখতে পায় রেললাইন, লোহালক্কড়, কয়লার গুঁড়োয় কালো মাটি, ধোঁয়া। তাদের ঝোপড়া থেকে আকাশটাও পরিস্কার দেখা যায় না। নিবিড় গাছপালার মধ্যে এলে তার ভিতরে যেন একটা আনন্দের তুবড়ি জ্বলে ওঠে। বহু রঙের বিস্ফোরণ ঘটে যায়।

সাদা সুন্দর কাঞ্চনফুলে ছেয়ে আছে কয়েকটা গাছ। চটের থলিতে সে বিস্তর সব্জি তুলেছে। কচি লাউ, ঝিঙে, কাঁচা লঙ্কা, ছোট একটা কুমড়ো, কিছু বরবটি। ফুল দেখে মনটা নেচে উঠল। থলি রেখে সে টপাটপ ফুল তুলতে লাগল। কোঁচড় ভরে। রুখু তেলহীন লালচে চুলের খোঁপায় টপ করে সে একটা থোকা গুঁজে দেয়। আরশি নেই। থাকলে দেখত নিজেকে একটু।

পচু নামে একটা ছেলেকে জানে দুখিয়া। ওরা ব্রাহ্মণ আর বাঙালি। মগনের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয় না। তবে পচুরাও গরীব, এই যা মিল। ঝোপড়ার রামবিখ গরু পোষে। তার মেয়ে বুচিয়ার সঙ্গে পচুদের বাড়িতে মাঝে মাঝে দুধ দিতে গেছে দুখিয়া। বেশী না, এক পোয়া দুধ নেয় ওরা। তাও আবার দাম বাকি পড়ে যায়। পচুর বাবা রেলে কাজ করে। কী কাজ করে তা জানে না দুখিয়া। তবে একদিন সে দেখেছিল, রেলের কোটপ্যান্ট পরা এক বাবু পচুর বাবাকে খুব ধমকাচ্ছে।

পচুর দিকে দুখিয়া কখনো ভাল করে তাকায়নি। তবে ছেলেটা অদ্ভুত। খুব বড় বড় চোখ, মুখখানা ভারী সুন্দর। দুখিয়ার চেয়ে একটু লম্বা। পচু উঁচু ক্লাসে পড়ে আর গান গায়। দুখিয়াকে কি সে কখনো দেখেছে ভাল করে? মনে হয় না। তবে ওদের কোয়ার্টারে একটা পেয়ারা গাছ আছে। একদিন পচু তাকে আর বুচিয়াকে দুটো পেয়ারা দিয়েছিল।

আজ দুখিয়ার খুব ইচ্ছে করছে, খোঁপায় ফুল গোঁজা এই চেহারায় পচুর সামনে একবারটি গিয়ে দাঁড়ায়। এমনিই।

কুকুরটা ডাকছে। ছুটে আসছে। টের পেল দুখিয়া। তবে তার ভয় নেই। কুকুরটা দৌড়োয় মাত্র তিন পায়ে। পিছনের বাঁদিকের পা-টা খোঁড়া। জোরে দৌড়তে গেলে সেদিকটা মাটিতে বসে যেতে থাকে।

দুখিয়া থলিটা তুলে নেয় তারপর বাগানের সীমানার দিকে হাঁটতে থাকে। গায়ে গাছপালার শিরশিরানি স্পর্শ, পায়ের তলায় ঘাস। বাতাসে মন কেমন করা গন্ধ।

খোঁড়া কুকুরটা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসছে। খুব ডাকছে। দুখিয়া তবু ছোটে না। উদাস ভাবে হাঁটতে থাকে। কুকুরটা কামড়ায় না, সে জানে। বুড়ো মালী তাকে যদিও বা ধরতে পারে তবু তেমন কিছু বলবে না, সে জানে। এ সব জানা থাকলে ভয় কমে যায়।

মগন, তার বাবা, দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। সে শুনেছে, বাবা ছাড়া তার দুনিয়ায় আর কেউ নেই। কিন্তু কথাটা তার বিশ্বাস হয় না। বুচিয়া একদিন তাকে বলেছে, তার মা আছে, নানা আছে। থাকলেও তার কিছু নয়। দুখিয়া তো তাদের অচেনা। বাবা থাকলেই হয়।

কিন্তু এখন তার একটু অন্য রকমও ইচ্ছে হয়। এমন একজনের সঙ্গে তার ভাব করতে ইচ্ছে হয় যাকে সে অনেক কথা বলতে পারে। যাকে সে সব কথা বলতে পারে।

কুকুরটা একটা ঝোপ ভেঙে চলে আসে কাছে। থমকে দাঁড়ায় এবং অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হাউ হাউ করে ওঠে। প্রত্যেকটা ধমকের সঙ্গে শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

দুখিয়া কুকুরটার নাম জানে। মংলু। সে কুকুরটার দিকে চেয়ে একটু হেসে বলে, মংলু! মংলু! আয় আয়।

মংলু যথার্থই বাজে কুকুর। কাজের নয়। আদরের ডাক শুনে লেজ নাড়াতে লাগল। নাকি দুখিয়া যে ডাগর হয়েছে সেটা আজকাল কুকুর বেড়ালেও টের পায়?

বাগানের শেষ সীমানা অবধি কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গে এলো। লেজ নাড়তে নাড়তেই। দুখিয়া তার দিকে চেয়ে একটু হাসে। তারপর দুটি লতানে হাতে দেওয়ালের কানা ধরে অনায়াসে উঠে যায় ওপরে।

মগন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দূর থেকেই মেয়েকে মুগ্ধ চোখে দেখে। কাছে আসতেই বুক ভরে সে মেয়ের গায়ের শৈশব-গন্ধ নেয়। পিঠে হাত রেখে বলে, চল।

দুপুরের রোদে দুটি খাটো ছায়ার সঙ্গে হেঁটে হেঁটে চলে দুজন মানুষ।

পনু দৃশ্যটা দেখে তাদের বাড়ির ছাদ থেকে। চিলেকোঠার ছায়ায় সে বসে একখানি বই পড়ছে। পড়ার বই। কিন্তু সে জানে, লেখাপড়া আর বেশী দিন নয়। বাবার চাকরির আয়ে সংসার চলে না। লেখাপড়া তাদের কাছে বিলাসিতা। স্কুল পেরোলেই তাকে কাজের ধান্ধা করতে হবে। তাই মনটা উদাস লাগে তার। বিষণ্ণ লাগে। কত কী হওয়ার ইচ্ছে ছিল তার। ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, ব্যারিস্টার, কিংবা ও রকম কিছু। হবে না। আগে পেটে ভাত, তারপর সব।

ছাদের আড়াল থেকে সে উদাস চোখে দেখছিল খাঁ-খাঁ দুপুরের শূন্যতাকে। কী অর্থহীন বিস্তার! একটা কাক আলসেয় বসে ডাকছে কা-কা। খা-খা।

কুঁজো লোকটাকে প্রথমে দেখা গেল, রাস্তার বাঁকের মুখে। পিছনে দীঘল মেয়েটা। দুধওয়ালীর মেয়ে বুচিয়ার সঙ্গে কতবার এসেছে এ বাড়িতে। বেশ দেখতে। টানা টানা দুটি চোখ, মুখখানা ভারী মায়াবী। তবে বুচিয়া চুপি চুপি জানিয়ে গেছে, দুখিয়া চোর। খুব সাবধান।

লোকটা থমকে দাঁড়াল। তারপর মেয়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে একটা ইশারা করল। মেয়েটা মাথা নাড়ল। না, রাজি হচ্ছে না।

পচু চুপ করে বসে থাকে। মনটা বিষণ্ণ। তবু দেখে। কী মতলব ভাঁজছে ওরা? ঘরে মা ঘুমোচ্ছে। ভাই-বোনরা স্কুলে। পচু ছাদে বসে পরীক্ষার পড়া করছে। পিছনের খোলা উঠোনের কলতলায় পড়ে আছে এঁটো বাসন। বিকেলে ঠিকে-ঝি এসে মাজবে। কয়েকটা কাক বাসনের ধারে কাছে বসে ঠোকরাঠুকরি করছে।

পচু দেখতে থাকে। কুঁজো লোকটা একটা গাছের ছায়ায় সরে দাঁড়ায়। মেয়েটা ধীর পায়ে বাড়ির পিছন দিকটায় ঘুরে উঠোনের ধারে এসে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। অবাক চোখে চেয়ে দেখল চারধারে।

পা টিপে টিপে চলে এলো উঠোনের কলতলায়। টুক করে একটা কাঁসার গেলাস তুলে ময়লা জামার আড়ালে লুকিয়ে ফেলল।

পচু ছাদ থেকে সিঁড়ি বেয়ে নামল না। তাতে সময় লাগবে। মেয়েটা পালাবে। সে টপ করে জানালার ওপরকার খাঁজে পা রেখে নীচে লাফিয়ে পড়ল।

মেয়েটা তার বাবার কাছ বরাবর চলে গেছে প্রায়। পচু পিছন দিক থেকে নিঃশব্দে দৌড়ে গিয়ে চেপে ধরল মেয়েটার একখানা হাত।

মেয়েটা এতটুকু জোর করল না। হাত ছাড়িয়ে নিল না। নরম শরীরে ফিরে দাঁড়াল তার মুখোমুখি। চোখে অগাধ সমুদ্রের বিস্ময়। অন্য হাতটায় লুকোনো গেলাস বের করে বাড়িয়ে দিল তার দিকে।

পচু গেলাসটা নিল না। দুখিয়ার চোখে চোখ রেখে ধমক দিতে যাচ্ছিল সে। তার বদলে হেসে ফেলল।

মগন একটু ভয় খেয়েছিল ঠিকই। তবে দৃশ্যটা দেখে তার এক রকম ভালই লাগল। না, মেয়েটা ডাগর হয়েছে। সত্যিই ডাগর হয়েছে। এবার বিয়ের চেষ্টা দেখতেই হয়।

সূত্রসন্ধান

ছোটবেলা থেকেই—অর্থাৎ যখন আমার বয়স ছয় কি সাত—তখন থেকেই আমার ভেতরে একরকমের অদ্ভুত অনুভূতি মাঝে মাঝে দেখা দিত। এই অনুভূতি কিরকম তা স্পষ্ট করে বোঝানো খুব শক্ত। তবে একথা বলা যায় যে, অনুভূতিটা একধরণের অবাস্তবতার। একা একা থাকলে হঠাৎ কখনো চারদিকে চেয়ে মনে হত—আমার চারদিকে যা রয়েছে—গাছপালা, কিংবা ঘরের দেয়াল, আসবাব, কিংবা মানুষ—এরা সবাই অবাস্তব, মিথ্যে। এসব জিনিসপত্র, গাছপালা এরা কোনটাই সত্য নয়। এরকম ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ মাথা গুলিয়ে উঠত। এই চিন্তা মুহূর্তের মধ্যে প্রবল আকার ধারণ করত, মনে হত—এই পৃথিবীতে যা আমি চোখের সামনে দেখছি তা সবই এক অদ্ভুত উদ্ভট অবাস্তব ব্যাপার, এসবের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। আমি এই পৃথিবীর কেউ না। এই প্রত্যক্ষ বস্তুগুলি, এই আলো-অন্ধকার, এই প্রিয়জন—এসবই যেন আমার চারদিকের এক মিথ্যে, অলীক আবরণ মাত্র। ভাবতে ভাবতেই আমার শরীর যেন ঊর্ধ্বদিকে উঠতে থাকত, গা শিউরোতো। আমার মনে হত এক ভীষণ যন্ত্রণায় আমার মাথা ফেটে যাচ্ছে। আমার মন কিছুতেই এই চিন্তা তখন আর করতে চাইত না, কিন্তু চিন্তা তখন আমাকে ছাড়তও না। বেশ কয়েকটা ঝাঁকুনি দিত আমাকে। কিছুক্ষণ আমি আমার মধ্যে থাকতাম না। এই অনুভূতি আমার শরীরে এবং মনে এত প্রকট এবং প্রবলভাবে দেখা দিত যে, আমার বিশ্বাস ছিল এটা আমার অসুখ। সাঙ্ঘাতিক ধরনের কোনো অসুখ।

অস্বীকার করা যায় না, এটা একরকমের অসুখই। অবাস্তবতার এই অনুভূতির দার্শনিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে। পরবর্তীকালে কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের জীবনী পড়তে গিয়ে দেখেছি, তাঁরও অনেকটা এ ধরণের অনুভূতি হত। তিনি তখন দেয়ালে বা মাটিতে হাত চেপে ধরতেন, শরীরে ব্যথা দিতেন, এবং আস্তে আস্তে সেই শারীরিক

বেদনা তাঁর মানসিক ক্লেশকে উপশমিত করত। এ মুষ্টিযোগ আমার জানা ছিল না। তবে এই অনুভূতি টের পেলেই আমি জলে-ডোবা মানুষের মতো প্রাণপণে মনের ওপর ভেসে থাকতে চাইতাম। বাস্তবিক ঐ সময়ের অভিজ্ঞতা ছিল, যেন আমি এক অথৈ অনন্ত জলে ডুবে যাচ্ছি।

বছরে এরকম হত দুবার কি তিনবার। প্রথম প্রথম অনেকদিন বাদে বাদে হত। অনেক সময়ে ছেলেমানুষী বুদ্ধিবশত আমি ইচ্ছে করেই ঐ অনুভূতিটা আনতে চেষ্টা করতাম। হাতে হয়ত কোনো কাজ নেই, খেলা নেই, একা ঘরে বসে আছি, সে সময়ে হঠাৎ ভাবতাম —আচ্ছা, আমার যদি এখন ওরকম হয় তবে কী হবে। এই ভেবে আমার চারদিকে চেয়ে গাছপালা, কি দেয়াল, কী আসবাব ইত্যাদিকে অবাস্তব, অলীক ভাবতে চেষ্টা করতাম। আশ্চর্য এই যে, চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে আমার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যেত, আমার শরীর হাল্‌কা হয়ে যেন ওপরে উঠে যেতে থাকতো এবং মনের ভিতরে এক অথৈ কূলকিনারাহীন কালো জল আমাকে গভীরে আকর্ষণ করত। এরকম ভাব স্থায়ী হত বড়জোর এক-আধ মিনিট। কিন্তু ঐ এক-আধ মিনিট সময়েই আমার যন্ত্রণা এবং ভয় চূড়ান্ত জায়গায় উঠে যেত। চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করত। আবার ঘাম দিয়ে বোধটা প্রশমিত হত। আস্তে আস্তে স্বাভাবিকতা ফিরে পেতাম। শরীর এবং মন ক্লান্ত লাগত।

বয়স বাড়ে। খেলাধুলো, বন্ধুবান্ধব, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা সবই নিয়মানুসারে বেড়ে যায়। বাইরে ব্যস্ততা যখন নিজের মনকে আচ্ছাদন দিয়ে রাখে তখন মন দিয়ে খেলা আপনিই কমে যায়। একটু বয়স বাড়লে আমারও এই খেলা কমে গিয়েছিল। কমলেও কিন্তু ছাড়েনি। বছরে এক-আধবার হতই। বড় ভয় পেতাম। মাকে গিয়ে বলতাম— মা, আমার মাঝে মাঝে কীরকম যেন সব মনে হয়।

মা জিজ্ঞেস করত—কীরকম ?

ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারতাম না। মাও বুঝতে পারত না, কিন্তু ভয় পেতো। বলত—ওসব ভাবিস কেন ! না ভাবলেই হয়।

আমি নিজের ইচ্ছায় যে সব সময়ে ভাবতাম তা নয়। আমার আজও মনে আছে, যে আমি ইচ্ছে না করলেও কে যেন জোর করে আমার ভিতরে ইচ্ছেটাকে তৈরি করে দিত। ভাবতে চাইছি না, তবু

আমার ভিতরকার এক অবাধ্য দুরন্ত বালক যেন জোর করে আমাকে ভাবিয়ে তুলছে।

আমার বাবার ছিল রেলের চাকরি। ফলে এক জায়গায় বেশীদিন থাকা আমাদের হত না। নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হত। সেইসব জায়গার সর্বত্র তখন লোকালয় ছিল না। কোনো টিলার ওপরে বা নির্জন জায়গায় বাবা কোয়ার্টার বা বাংলো পেতেন। আমাদের পরিবারে লোকসংখ্যাও ছিল সামান্য। দিদি, আমি, ছোটো বোন, ভাই তখনো হয়নি। সেই সব নির্জন জায়গায় আমার বন্ধু জুটত কমই। যা-ও জুটত তারা ছিল কুলীকামিন বা বাবুর্চি-বেয়ারার ছেলেরা। তারা আমার সঙ্গী হয়ে উঠত, বন্ধু হতে পারত না। ফলে মনের দিক থেকে একাকীত্ব কখনো ঘুচত না। পৃথিবীতে বন্ধুর মতো জিনিস খুব কমই আছে। যার সৎ বন্ধু থাকে তার অনেক মনের অসুখ ভাল হয়ে যায়। সেই বয়সে বন্ধু ভাগ্য আমার ছিলই না। ফলে ঐ মানসিক একাকীত্ব আমার অসুখটাকে বাড়িয়ে তুলত। কিছু করার ছিল না। গুরুজনদের বুঝিয়ে বলতে পারতাম না বলে সেই যন্ত্রণা একা সহ্য করতে হত।

ক্রমে বড় হয়ে উঠতে উঠতে আত্মসচেতনতা বাড়তে লাগল। খেলাধুলা করি, স্কুলে যাই, দুষ্টুমি করে বেড়াই। বাইরে থেকে দেখে স্বাভাবিক অন্য ছেলেদের মতোই লাগে আমাকে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমার বিশিষ্ট এক 'আমি' তৈরি হতে থাকে। সব মানুষেরই যেমন হয়। উল্লেখের বিষয় এই যে, আমার ছেলেবেলাতেই যে 'আমি' তৈরী হয়েছিল তার বৈশিষ্ট্য ছিল বিষন্নতা, অন্যমনস্কতা, চিন্তাশীলতা, একাকীত্ববোধ, নিঃসঙ্গতা। এই ধরণের ছেলেরা সাধারণত বই পড়তে ভালবাসে। খেলাধুলা বা আমোদপ্রমোদে, লোকসঙ্গে, ভিড়ে তেমন আনন্দ পায় না। বই পড়তে পড়তে বল্গাহীন কল্পনাকে ছেড়ে দেওয়া, অবাধ চিন্তার রাজ্যে প্রিয় নির্বাসন—এর চেয়ে স্বাদু আমার কিছুই ছিল না। কাজেই অনিবার্যভাবে বাস্তবতাবোধ, কর্মপ্রিয়তা বা কোনো কাজে পটুত্ব কমে যেতে লাগল। কল্পনাবিলাসীর ভাগ্য যেরকম হয়ে থাকে। চিন্তার রাজ্যে যে রাজা উজীর, বাস্তবক্ষেত্রে সে প্রায় অপদার্থ।

খেলাধুলোয় আমার খানিকটা দখল ছিল। বলে শট মারতে ভালই পারতাম, ক্রিকেটে ব্যাট চালানো আনাড়ীর মতো ছিল না,

হাইজাম্প-লঙজাম্প বা দৌড়ে পটুত্ব না থাক, অভ্যাস ছিল। অনুষ্ঠান বা সাংস্কৃতিক সম্মেলনে কবিতা আবৃত্তি করতাম। কিন্তু সেগুলো ছিল আমার মনের উপরিভাগের ব্যাপার। মনের গভীরতর স্তরেও বাইরের এসব দৌড়-লাফ-আবৃত্তি তরঙ্গ তুলত। সেখানে ছিল এক অনপনেয় স্পর্শকাতরতা, আত্মচিন্তা, অভিমান। বাইরের জীবনের যত অকৃতিত্ব-রাগ-ক্ষোভ সব সেখানে গিয়ে বাসা বাঁধত। এবং সমস্ত আঘাতই সেখানে বারংবার কল্পনার রাজ্যের দরজার পাল্লা উন্মোচিত করে দিত। বাইরের জগতের ব্যর্থ 'আমি' সেই কল্পনার জগতে আশ্রয় পেতাম। কল্পনার জগতে বহু মানুষেরই বিচরণ—তবে তার তারতম্য আছে। নিজেকে নিয়ে যার যত চিন্তা, অস্বস্তি, আত্মমগ্নতা, তার বাস্তববুদ্ধি তত কম, আঘাত সহ্য করার শক্তি সামান্যই, আত্ম-নির্ভরশীলতা প্রায় শূন্য। আমারও সেই বিপদ দেখা দিতে লাগল। আমি আরো বেশী করে বই আর বইয়ের মধ্যে ডুবে যেতে লাগলাম। হাতে যখন বই থাকত না তখন মনে কল্পনা থাকত।

যে অনুভূতির কথা বলছিলাম তার বীজ সম্ভবত নিহিত ছিল এখানেই। চারদিকের পৃথিবী এবং ঘটনাপ্রবাহে অবগাহন না করলে মনটা কেবলই শিকড়হীন গাছের মতো নিজের চারধারে পাক খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে কুঁকড়ে যায়। বাস্তবতার জ্ঞানবর্জিত মন হচ্ছে আত্মভুক। নিজের মজ্জা-মাংস-রক্ত ছাড়া সে আর খাদ্য-পানীয় পাবে কোথায়? ফলে তার দেহের পুষ্টি এবং লাবণ্য-সঞ্চার হচ্ছিল না। অল্প বয়সেই আমার মুখেচোখে বিষণ্ণতা ভর করতে লাগল।

মাঝে মাঝে কাজে-অকাজে বাল্যকালের সেই অনুভূতি দেখা দেয়। সেই অনুভূতির বিস্ময়বোধ আমাকে ভীত, চঞ্চল করে তোলে। সমাধান পাই না। বাল্যকাল চলে গিয়ে কৈশোর আসছে—টের পাচ্ছি। দেহটি যষ্ঠির মতো সরল সোজা ওপরে উঠে যাচ্ছে, রোগা হাড়সার দেহ, অন্যমনস্ক, চিন্তাশীল, রুগ্ন এক কিশোর। বই পড়তে ভালবাসে, কিন্তু পড়ার বইতে তার অনীহা। অর্থাৎ যা-কিছু কাজের কাজ তার কোনোটাতেই আগ্রহ নেই।

মনে আছে আলিপুরদুয়ারে এক স্পোর্টসে নাম দিয়েছি। অঙ্ক রেস। দর্শকদের মধ্যে আমার মা-বাবা, ছোটো দুটি ভাইবোন আর দিদিও রয়েছে। তাদের জন্যই বড় লজ্জা করছিল আমার। দৌড় শুরু হল। কুণ্ঠাজড়ানো পায়ে দৌড়ে গিয়ে কাগজের ওপর

লেখা অঙ্কে উপুড় হয়ে পড়লাম। যোগ শেষ করে সবার আগে উঠেছি, দৌড়ে যাচ্ছি। নিশ্চিত ফার্স্ট, কেউ ঠেকাতে পারবে না। হঠাৎ মনে হল, কাগজে নাম লেখা হয়নি। নাম লেখা না হলে বিচারকর্তা বুঝবে কি করে যে অংকটা আমিই করেছি! ভেবে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ফিরে যাবো? নামটা লিখে নিয়ে আসব? ভাবতে ভাবতেই আর একটা ছেলে উঠে দৌড়ে এল। দেখতে পেলাম আমার প্রথম স্থান হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। অথচ কাগজে নামও লেখা হয়নি। এই কয়েক মুহূর্তের দ্বিধা-সংকোচের সুযোগে ছেলেটা আমাকে পিছনে ফেলে দৌড়ে গিয়ে তার কাগজ জমা দিল। তখন বোকার মতো অগত্যা আমিও গিয়ে নামহীন কাগজ জমা দিলাম। অংক-রেসের নিয়ম অনুযায়ী অংক ভুল হলে ফার্স্ট হলেও ফার্স্ট হবে না। অংক ঠিক হওয়া চাই। অত প্রতিযোগীর মধ্যে আমরা যে প্রথম দুজন. তাদেরই অংক ঠিক হয়েছিল। ফাস্ট হল সেই ছেলেটা, আমি সেকেণ্ড। পরে জানতে পারলাম যে. সেই ছেলেটাও কাগজে নাম লেখেনি। কিন্তু তার বাস্তববুদ্ধি প্রখর বলে সে নাম লেখার কথা ভাবেওনি। আমি ভাবতে গিয়ে তার অনেক আগে অংক শেষ করেও পিছিয়ে পড়েছি। সেদিনই বুঝতে পারি. আমার সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে দ্বিধা। সেই অংক রেসের শেষে মা খুব হতাশ হয়ে বলেছিলেন -- সবার আগে তুই উঠেছিস দেখে ভাবলাম যাক্ রুনু এবার ফাস্ট হবে। ওমা মাঝরাস্তায় দেখি ক্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে আছিস হাঁ করে। কী অত ভাবছিলি? বলে রাখা ভাল যে সেই রেসে সেকেণ্ড প্রাইজ ছিল না।

পরবর্তীকালে বহুবার দেখেছি সবার আগে উঠেও দৌড় শেষ করতে পারছি না। পৃথিবীতে সঠিক জায়গায় নিজেকে নিয়োগ করতে হলে খানিকটা আবেগহীন, দ্বিধাশূন্য নিষ্ঠুরতা দরকার। জানা দরকার বাস্তব কলাকৌশল। নিজের ভুল-ত্রুটি নিয়ে মাথা ঘামানোর চেয়ে সর্বদা নিজেকে এগিয়ে রাখার চেষ্টাই ভাল। কিন্তু তা তো হল না।

বাঙালী ছেলেদের যে ভাবপ্রবণতার কথা শোনা যায় তা মিথ্যে নয়। আমার ভিতরে এই ভাবপ্রবণতার বাড়াবাড়ি বরাবর ছিল। সহজ আবেগে উদ্বেলিত হই, সহজ দুঃখে কাতর হয়ে পড়ি। চোখের সামনে পুজোবাড়ির বলি দেখে ভয়ঙ্কর মন খারাপ হয়। মনের এই ন্যাতানো

স্বভাব থাকলে বড় হওয়ার পথে নানারকম বাধা বিপত্তির সৃষ্টি হয়। ভাবাবেগ জিনিসটা খারাপ নয়, অনেক আঘাত থেকে মানুষকে রক্ষা করে। কিন্তু ভাবাবেগের নিজস্ব কিছু আঘাত আছে, তা থেকে আত্মরক্ষা করা খুব দুরূহ।

ছেলেবেলা থেকেই আমি রোগা। হিলহিলে শরীর, বারোমাস পেটের অসুখ, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড—একটা-না-একটা কিছু লেগেই থাকত। বাড়িতে রেলের ডাক্তারদের আনাগোনার বিরাম ছিল না। যখন বড় হয়েছি তখনো সেইসব ছেলেবেলায় আমার চিকিৎসা যাঁরা করেছিলেন সেইসব ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা হলে তারা বলতেন—কেমন আছিস রে?

—ভাল।

—খুব ভুগিয়েছিলি ছেলেবেলায়।

মা বাবার আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল খুব। আমার দশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি ছিলাম মা-বাবার একমাত্র ছেলে। আমার দু বছরের বড় দিদি, আট বছরের ছোট বোন, কাজেই দশবছর বয়স পর্যন্ত বাড়ির সবটুকু আদর আমি নিংড়ে নিতাম। বড় মাছ, দুধের সরটুকু, ভাল জামা-কাপড়—সবই পেতাম। সেই একমাত্র ছেলে কিরকম হবে না হবে—বাঁচবে কি বাঁচবে না—এই নিয়ে মা-বাবার ছিল নিরন্তর ধুকপুকুনি। বাবা অনেক সাধু-সন্ন্যাসীকে বাসায় আনতেন, মাও জ্যোতিষ বা পশ্চিমা সাধু দেখলে ডেকে আনতেন। দাতাবাবা, অ্যামেরিকা-প্রবাসী রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসী, ভিখিরি সাধু কত এসেছে গেছে। তাদের অনেকে আমার হাত বা কোষ্ঠী বিচার করে বলেছে—এর সন্ন্যাসের দিকে টান। একে কোনো সুন্দর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবেন। নেপালের রাজজ্যোতিষী পরিচয় দিয়ে এক কালা জ্যোতিষ আসতেন আমাদের বাড়িতে। আমাকে দেখে বলেছিলেন—এই ছেলে মাঘ মাসে মারা যাবে।

বাবা ভীষণ ঘাবড়ে বললেন—কিন্তু আমি তো কোনো পাপ করিনি।

জ্যোতিষ মাথা নেড়ে বললেন—তবু মরবেই।

—উপায়?

—উপায় আর কী? মাদুলি। বাবা আর আমি দুজনেই দুটো মাদুলি ধারণ করলাম। আমি মরলাম না।

যা বলছিলাম,'আমার দশ বছর বয়সের সময়ে আমার ছোটো ভাই হয়। তাতে অবশ্য আমার আদর কমেনি। রোগেভোগা ছেলে বলেই বোধহয় বরাবর সমান তালে আদর পেয়ে এসেছি। আজও পাই। আমার রোগও হত এক-একটা মারাত্মক। মাল জংশনে সেবার হল সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া। ঘোর জ্বরের মধ্যে দেখছি দুই ধারে উঁচু পাহাড়। দুই পাহাড়ের গায়ে একটা দড়ি দোলনার মতো টাঙানো হয়েছে। সেই দড়িতে আমি বসে আছি। নিচে গভীর—গভীর এক খাদ। সেই খাদে পাহাড়ী নদী বয়ে যাচ্ছে। একটু দূরে একই রকম আর একটা দোলনা। সেই দোলনা থেকে আমাদেরই পরিচিত এক ভদ্রলোক বন্দুক হাতে আমার দিকে গুলি ছুঁড়ছেন। গুলি গায়ে লাগছে না। দোলনাটা দুলছে। আমি দুহাতে দোলনার দড়ি ধরে চেঁচাচ্ছি ভয়ে। এ তো স্বপ্নের দৃশ্য। ওদিকে বাস্তবে আমার জ্বর তখন একশ' ছয়ের ওপর। মাথায় তীব্র রক্তস্রোত জমা হচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে মৃত্যু হতে পারে। মাল জংশন তখন ছোটো জঙ্গলে জায়গা। ডাক্তার বদ্যি, ঔষধ কিছু পাওয়া দুষ্কর। রেলের ডাক্তার বক্কর খান সুচিকিৎসক নন! তাঁর ওপর কারো ভরসা নেই। ভাগ্যক্রমে বাবা বাসায় ছিলেন। বক্কর খানকে সময় মতোই খবর দেওয়া হল। তিনি যখন এসে পেঁছোলেন তখন আমার খিঁচুনি উঠে গেছে। বক্কর খান অন্য রোগের চিকিৎসা জানুন বা না জানুন, ম্যালেরিয়াটা খুব ভাল চিনতেন। আমার অবস্থা দেখেই কোন্ ধরণের ম্যালেরিয়া তা বুঝতে পেরেই চিকিৎসা শুরু করেন। আমি মৃত্যুর কয়েকঘণ্টা দূরত্ব থেকে ফিরে আসি।

এইরকম রোগে ভুগে ভুগে আমার শরীর যেমন নষ্ট হয়েছিল, তেমনই নষ্ট হয়েছিল আমার মন। মনের জোর কাকে বলে তা জানতামই না। অল্পে ভয় পাওয়া, হাল ছেড়ে দেওয়া, আত্মবিশ্বাসে অভাব—আমি এগুলোই মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু এসব নিয়ে বেঁচে থাকা যায় না। বাস্তবে অপদার্থ বলেই বোধ হয় মনটা দিন দিন অবাস্তব কল্পনাপ্রবণ হয়ে উঠেছিল। আমার বাস্তবের অপদার্থতা কল্পনা দিয়ে পুষিয়ে নিতে চেষ্টা করতাম। কল্পনার রাজত্বে আমি ছিলাম বীর, সাহসী, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এক মানুষ। কল্পনায় বাস করার বিপদ হচ্ছে এই, কল্পনার বাইরের এই বাস্তব জীবনে সামান্যতম দুঃখ বেদনা অপমান সহ্য করার মতো ব্যর্থতা মেনে নেওয়ার

মতো জোর অবশিষ্ট থাকে না। কল্পনাপ্রবণ মানুষ তাই দিশেহারা হয়ে যায় সামান্য বিপদ বা দুঃখে। কিছু ঘটলেই তার মনে ঝড় ওঠে এবং দীর্ঘকাল সেই ঝড়ের প্রতিক্রিয়া থেকে যায়।

স্কুলে পড়ার সময়ে আমাকে ঘর ছেড়ে অচেনা ছেলেদের মধ্যে যেতে হল। সেখানে এল মানিয়ে নেওয়ার প্রশ্ন। হুল্লোড়বাজ ছেলেরা খ্যাপায়, পিছনে লাগে। অশ্লীল কথা বলে, ঝগড়া করে, গাল দেয়। মাস্টারমশাইরা নিষ্ঠুর। মারকুটে. স্নেহহীন এই পরিবেশে মন অসুস্থ হয়ে পড়ে। স্কুলে যাওয়ার নামে গায়ে জ্বর আসে। টিফিনে চাকর খাবার নিয়ে যায় দেখে ছেলেরা খ্যাপায়। আমার খেতে লজ্জা করে। স্কুলে যাওয়ার পথে রেলগাড়ির শান্টিং দেখে সময় নষ্ট করি। দেরি হয়ে যায়, বাড়িতে ফিরে এসে মাকে বলি—স্কুল বসে গেছে। ঢুকতে দিল না।

ঢুকতে দিচ্ছে না, আমাকে ঢুকতে দিচ্ছে না। প্রচণ্ড এক প্রতিযোগিতার জগতে আমি ঢুকতে পারছি না। ঢুকতে না পাওরার সেই প্রথম বোধ। ঠিকই টের পেয়েছিলাম, প্রতিদ্বন্দ্বীময় এক অদ্ভুত রূঢ় জীবন সামনে পড়ে রয়েছে।

আমার জীবন এইভাবে শুরু হয়েছিল, ভয়ে, বিষণ্নতায়, অনিশ্চয়তার সঙ্গে।

ক্রমে অবশ্য পৃথিবীকে সয়ে নিচ্ছিলাম। কিন্তু জানতাম, সম্মুখস্থ যুদ্ধে আমার নিশ্চিত হার, হারতে হারতেই বেঁচে থাকতে হবে, পৃথিবীতে আমার অস্তিত্বের কোনো গভীরতা থাকবে না।

যখন আমরা আমিন গাঁওতে থাকি তখন আমাদের বাসাটি ছিল ঠিক ব্রহ্মপুত্রের ধারে একটা টিলার ওপরে। খাড়া টিলা, তার নীচে ব্রহ্মপুত্র বাঁক নিয়েছে। ওপাশে নীল পর্বত, দুই পাহাড়ের মাঝখানে ব্রহ্মপুত্র সফেন গর্জন করে বয়ে চলে। ফেনশীর্ষ জলরাশি গম্ভীর ক্রোধের ধ্বনি বর্ষাকালে দুই পাহাড়ের মাঝখানের শূন্যতায় প্রতিধ্বনি তোলে ভয়াবহ। ফেরী যখন পেরোয় তখন তীর ঘেঁষে অনেকটা সাবধানে উজিয়ে স্রোত ধরে ভাটিয়ে গিয়ে ওপারের জেটিতে লাগে। নৌকা চলে খুব কম, বেচাল হলেই নৌকা ওলটায়। আমার বয়স সে সময়ে বছর তেরো, সেই বয়স যখন মা-বাবার ওপর, বন্ধু বা প্রিয়জনের ওপর নানা তুচ্ছ কারণে রাগ বা অভিমান বুকের পাঁজরা ভেঙে উঠে আসতে চায়। মাকে খুব ভালবাসতাম। সেই ভালবাসার মধ্যে আবার

নির্দয় প্রতিশোধের চিন্তাও থাকত। মার ওপর রাগ করে একদিন দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়ে টিলা থেকে নামলাম। ইচ্ছে বাড়ি ছেড়ে পালাবো। খুব দূরে কোথাও চলে যাবো। অনেকবার এমন ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু সাহস হয়নি।

সকালের ফেরী ছেড়ে গেছে। বর্ষার ভয়াবহ নদী মাতালের মতো টলতে টলতে যাচ্ছে। তার জলের দোলা দেখে প্রাণ গম্ভীর হয়ে যায়। তীরে কয়েকটা নৌকা বাঁধা। সকালের স্টীমার ধরতে না পারা কিছু লোক ওপারে পাণ্ডুতে যাবে বলে জড়ো হয়েছে। আমি তাদের দলে ভিড়ে গেলাম। কোথায় যেতে চাই এখনো তা স্পষ্ট নয়, যাবো, চলে যাবো চিরদিনের মতো এটুকুই জানি। হয়তো সন্ন্যাসী হয়ে যাবো, হয়তো হবো মস্ত মানুষ। কে জানে! আমার বুকে থমথমে অভিমান আছে, আছে প্রতিশোধস্পৃহা। আর কিছু নেই, তবু ওটুকুই তখনকার মতো যথেষ্ট।

আমাদের টিলাটা বেড় দিয়ে নৌকো চলল প্রথমে উজানে। অনেকটা দূর গিয়ে স্রোতে গা ছেড়ে পেছিয়ে আসবে। আসতে আসতে স্রোতকে ফাঁকি দিয়ে ওপারের ঘাটে বাঁধবে। বিপজ্জনক কৌশল। সাঁতার জানি, কিন্তু আত্মবিশ্বাস নেই, নদীর স্রোত ক্ষুরধার, একধারে বসে জল দেখছি। স্রোতের বেগ নৌকোয় ঝাঁকি দেয়, গুড়গুড় করে কাঁপায়। নৌকো ওঠে, নৌকো পড়ে। মানুষজন ছবির মতো স্থির বসে, মন চঞ্চল! মাঝিরা ঘেমে যাচ্ছে উজানে নৌকা নিতে। তাদের দাঁতে দাঁত, টান-টান দড়ির মতো হাত-পায়ে ছিঁড়ে আসা ভাব।

অনেকদূর উজানে গেলাম, টিলার ছায়ায় ছায়ায়, তখনো আমাদের বাড়িটা দেখা যাচ্ছে না। নৌকো যখন স্রোতের মুখে ছাড়ল তখন একটানে ঘূরপাক খেয়ে মাঝদরিয়ায় চলে গেছি। মাঝিরা হাঁকছে—সামাল! জল নৌকোর কানার সমান। অন্য ধার উঁচু হয়ে আছে। পৃথিবীটা সে সময়ে বাঁকা হয়ে ঝুলে আছে। আকাশ বুকের ওপরে। সেই সময়ে দিকের জ্ঞান ছিল না। বেভুল নৌকোটা যে কোনদিকে যাচ্ছে বোঝবার চেষ্টাও করিনি। নৌকোর কানা আঁকড়ে প্রাণপণে জীবনের সঙ্গে, আয়ুর সঙ্গে লেগে আছি। সাঁতার জানি, কিন্তু আমার কোনো জ্ঞানই যে সম্পূর্ণ নয়। অভিমান ভেসে যায়, ভয়ে চেঁচিয়ে ডাকি "মা"।

ঠিক সেই সময়েই হঠাৎ অলৌকিকভাবে মাকে দেখতে পাই। নীল

আকাশের গায়ে একটা টিলার কালচে সবুজ মাথা জেগে ওঠে, বাতিঘরের মতো, আমাদের বাসাটার লাল টিনের চাল দেখা যায়। বারান্দায় বাঁশের জাফ্রি। তার সামনে সিঁড়ির উঁচু ধাপটায় মা দাঁড়িয়ে আছে। সকালের রোদ পড়েছে চোখে। মা হাতের পাতায় চোখ আড়াল করে নিবিষ্ট মনে চেয়ে আছে নদীর দিকে। বিশাল এক অথৈ পৃথিবী তার সামনে। সেই সীমাহীন পৃথিবীর কোন দিকে গেল তার অভিমানী ছেলে! মা নিবিষ্টভাবে, আকুলভাবে দেখছিল, বুক থেকে আটকে থাকা শ্বাসের একটা পাখি বেরিয়ে গেল। নৌকো সোজা হয়ে চলতে থাকে। অভিমান ভুলে গভীর তৃষ্ণায় মার মূর্তিটার দিকে চেয়ে থাকি। দূর থেকে দূরে ক্রমে ছোটো হয়ে আসে মূর্তিটা। কিন্তু স্থির থাকে, বাতিঘরের মতো।

সেবার নিরুদ্দেশে যাওয়া হল না। ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে কামাখ্যা পাহাড়ে উঠে দুপুরের আগেই ফিরে এলাম।

বাসার বাইরে যে পার্থিব সংসার সেইটাই ছিল ভয়ের। সংসারের ভিতরে আমি মা-বাবার আদুরে ছেলে। ভাই-বোনের প্রিয় সহোদর। কিন্তু বাইরের পৃথিবীতে আমি কেউ না। একবার এক বুড়ো চীনেবাদামওয়ালার কাছে একটা অচল সিকি গছানোর চেষ্টা করেছিলাম ছেলেমানুষী বুদ্ধিবশত। মনে হয়েছিল, লোকটা বোধহয় চোখে ভাল দেখে না। বাদাম নিয়ে সিকিটা দিতেই সে সেটা হাতড়ে দেখল, তারপর আমার হাত চেপে ধরে সে কী চীৎকার—এ ব্যাটা চোট্টা আমাকে সাট্টা পয়সা দিতে এসেছে। পুলিস…পুলিস! বাজারের এক ভিড় লোক ছুটে এল। অচেনা পৃথিবীর বিরুদ্ধতা দেখে এমন ভয় পেয়ে দিশেহারা হয়েছিলাম সেদিন! আর একবার বন্ধুদের সঙ্গে হাটে গেছি। হাট থেকে চুরি করা ছিল বন্ধুদের একটা খেলা। আমি করতাম না, ভয় করত। সেবারই প্রথম সাহস করে একটা টিনের বাঁশী চুরি করেছিলাম। দোকানদার লক্ষ্য করেনি, করেছিল অন্য একটা উট্‌কো লোক। বাঁশী নিয়ে দোকান থেকে বেশ কিছু দূর চলে গেছি, হঠাৎ সেই লোকটা এসে আমার হাত ধরল, একটিও কথা না বলে পকেট থেকে বাঁশীটা বের করে নিয়ে চলে গেল। কেউ কিছু বুঝল না, কিন্তু আমি সেই লোকটার ঐ আচরণের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলতে পারিনি। লজ্জায় ভিড় ভেঙে পালিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর একা একা সেই ঘটনার কথা ভেবে কতবার এবং আজও গা শিউরে

ওঠে লজ্জায়, আধোঘুমে চমকে উঠি। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময়ে কাটিহারের খালাসীটোলার রাস্তায় একজন মুসলমান ছেলে আমাকে অকারণে গাল দিলে একটা চড় মেরেছিল। সে জানত না তার ঐ চড়টা আমার আত্মার গায়ে এত দীর্ঘকাল তার হাতের ছাপ রেখে দেবে। ভুলতে পারি না, কিছুতেই সেই চূড়ান্ত গাল আর চড়টি ভুলতে পারি না। সংসারের স্নেহচ্ছায়ার বাইরে নিষ্ঠুর ও উদাসীন এই পৃথিবীটা রয়েছে। অচেনা মানুষের হৃদয়হীনতা রয়েছে, তাদের আক্রমণ আক্রোশ, নিষ্ঠুরতা আমি কী করে ঠেকাবো!

এই মানবিকতা থেকেই একটা অসুস্থ বৈরাগ্য জন্ম নিয়েছিল। আমার শক্তিহীনতা, অনুজ্জ্বল মন, লড়াইয়ের আগেই পরাজয়ের মনোভাব আমাকে ক্রমশ সমাজ-সংসারের বাইরের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই, অচেনা মানুষ নেই, অপমান নেই, যেখানে আমি তৃপ্ত একাকী, সেই নির্জনতার দিকে টান পড়তে থাকে। এই বৈরাগ্য শক্তিমানের সন্ন্যাস নয়, দুর্বলের পলায়ন।

একবার এক সুখী বাড়িতে গেছি মা-বাবা ভাই-বোনদের সঙ্গে। বড়লোকের বাড়ি, বিলিতি আসবাব, বৈঠকখানায় মদের বার, ছেলেমেয়েদের মুখে ইংরেজী। তারা আমাদের খুবই সমাদর করেছিল। সে বয়সে আমি ছিলাম ভীষণ রোগা। সেই রুগ্নতা বোধহয় সেই বাড়ির কর্তার খারাপ লেগেছিল। একটা ছেলে এত রোগা হবে কেন? তিনি তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের সামনে বার বার জিজ্ঞেস করছিলেন, তুমি কি খাও না? ছোটো না? খেল না? তুমি অত রোগা কেন? সে ভারী অস্বস্তিকর একটা অবস্থা। আমার রুগ্নতা এমনিতেই আমার মা-বাবার দুশ্চিন্তার কারণ ছিল, তার ওপর ঐ সব প্রশ্ন মা-বাবারও ভাল লাগছিল না। প্রশ্ন করার ভঙ্গীটা ছিল অন্য ধরনের। তাতে সমবেদনা নেই, অনুকম্পও না। বরং চাপা একটু ঘেন্না আর শ্লেষ ছিল। সে কেবল আমিই টের পাচ্ছিলাম। সূচীমুখ যন্ত্রণা। নানা কথার মাঝখানে ঘুরে-ফিরে তিনি আমাকে অপমান করতে লাগলেন। জিজ্ঞেস করলেন, স্ট্রেট লাইনের ডেফিনেশন কী। পড়া ছিল, কিন্তু ঘাবড়ে যাওয়ায় সে মুহূর্তে মনে পড়েনি। বলতে পারলাম না দেখে তিনি সপরিবারে হাসলেন। আমি ঘামছি। আমার ভাই-বোনেরা তখন সে বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কলের গান বাজাচ্ছে, ছবির বই দেখতে দেখতে অবাক হয়ে যাচ্ছে, কুকুরকে বল ছুঁড়ে দিয়ে

খেলছে, আর আমি মায়ের কাছ ঘেঁষে কাঠ হয়ে বসে নিজের অপদার্থতার কথা ভাবছি। মনে হচ্ছিল, সমাজ-সংসার আমার জন্য নয়। পালাও পালাও! এরা সবাই তোমার শত্রু, প্রতিদ্বন্দ্বী, তোমার প্রতি এরা সবাই দয়াহীন। সংসারের বাইরে কোনো নির্জনতায় চলে যাও, সন্ন্যাসী-বৈরাগী হয়ে যাও। বেঁচে থাকা মানেই প্রতি মুহূর্তে বৃশ্চিক দংশন, সূচীমুখ যন্ত্রণা, বেঁচে থাকা মানে আত্মায় মলিন হাতের ছাপ। সুতো ছেঁড়ো, পালাও।

অগাণ্ডির মতো পাতলা নেটের পর্দা উড়ছে বাতাসে। কলের গান বাজছে, কী সুন্দর ঠাণ্ডা ঘর, নরম সোফা কৌচ, মহার্ঘ আসবাব, তবু এই পরিবেশে মানুষ কত নিষ্ঠুর ও হীন হতে পারে।

মা সবচেয়ে বেশী আমার ব্যথা বোঝে। চিরকাল মায়েদের এই ক্ষমতা। মা আমাকে একটু ঠেলে দিয়ে চাপা গলায় বলল, বাইরের বাগানটা তো সুন্দর, একটু ঘুরে-টুরে আয় না।

বেঁচে গেলাম।

সেই সুন্দর বাগানে প্রজাপতির খেলা দেখছি, আর মনে মনে নিজের জন্য লজ্জা হচ্ছে। কোথায় পালাবো? কেমন করে? সংসারের বাইরে যাওয়া ছাড়া আমার যে উপায় নেই!

ভদ্রলোকের দশ বছর বয়সের মেম চেহারার মেয়েটি ছুটে আসে। ভয়ে ত্রস্ত হয়ে তার দিকে চাই। সে কাছে চলে আসে বাতাসের মতো সাবলীল। কী সুন্দর জোরালো চেহারা তার, কী সদগন্ধ তার গায়ে! চোখে বিদ্যুৎ। নতুন অপমানের জন্য মনে মনে প্রস্তুত হতে থাকি। অপমান বা নিষ্ঠুরতা ছাড়া আমি বাইরের লোকজনের কাছ থেকে আর কিছুই আশা করতে পারি না যে!

সে বোধহয় তার ইস্কুলে নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার করতে শিক্ষা পেয়েছিল। এসে আমার হাতখানি ধরে বলল—চলো, ঐ কোণে আমার পড়ার ঘর, সেখানে বসি। তোমার গলার স্বর খুব সুন্দর, নিশ্চয় তুমি খুব ভালো কবিতা পড়তে পারো।

সে তার পড়ার ঘরে নিয়ে গেল আমাকে, কত বই তাদের! সে একটা ডিভানে আমার পাশে বসে রবি ঠাকুরের কবিতার বই খুলে বলল—একদম বাংলা পড়তে পারি না স্কুলে। ইংরাজী স্কুল তো, শেখায় না, অথচ কবিতা পড়তে আমি যে কী ভালবাসি!

জড়তা কাটতে সময় লেগেছিল, তবু ঐ একটা বিষয় আমি

পারতাম। ভাব ও অর্থ অনুযায়ী কবিতা পাঠ। পড়লাম। তার চোখে মুগ্ধতা দেখা দিল, তারপর করুণতর কবিতাগুলি পড়ার সময়ে অশ্রু। একটা বেলা কেটে গেল তার সঙ্গে।

—তুমি আমাকে শেখাবে? উঃ, কী যে পড়ো তুমি, শুনতে শুনতে যেন ভূতে পায়।

সংসারের বাইরে আর যাওয়া হয় নি। সুতো আজও ছিঁড়ি, কিন্তু কে যেন নতুন সুতোয় নতুন বঁড়শি অলক্ষ্যে গিলিয়ে দেয়।